দীনজনে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

উৎসর্গ

শ্রীভগবানের শ্রীচরণে—

॥ এক ॥

কোথা দিয়ে কেটে গেল একটা মাস। কি যে চলে গেল দেহের ওপর দিয়ে! শুধু মনে আছে কয়েকটা মুখ। ঝুঁকে আছে আমার মুখের ওপর! বেশি মনে আছে ছবির মুখ। যখন সুস্থ ছিলুম, তখন ছবি আমার ধারে কাছে ঘেঁষত না। অসুস্থ অবস্থায় আমার পাশ ছেড়ে তাকে তো যেতে দেখিনি। রোগা ডিগডিগে একটা ছেলে নেমে এল বিছানা থেকে। শীত এসে গেছে। রোদ কমলালেবুর মতো নরম। চারপাশ শুকনো ঝনঝনে। শীতের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। এসে গেছে শীতের পাখি।

সন্ন্যাসী বললেন, 'তোমার যে নবজন্ম হল, তা কি জানো? এইবার তোমার শরীরটাকে গড়তে হবে। সে দায়িত্বও আমার। তোমার খাওয়া, ব্যায়াম-যোগাসন সব চলবে আমার নিয়মে। ঠিক একমাস পরে দেখবে নিজেকেই আর চিনতে পারছ না।'

'আমার তা হলে ভালই হবে বলুন?'

'এখন থেকে ভাল আর মন্দ দুটোকেই তোমার সমান মনে হবে। অতএব ওই প্রশ্ন অবান্তর।'

'ভবিষ্যৎ জানতে চেও না। জানার ইচ্ছেও তোমার করবে না। সুখ-দুঃখ দেওয়ার যিনি মালিক তিনি তোমাকে সহ্য করার শক্তিও দেবেন। কিছু দিনের মধ্যেই তুমি বুঝতে আরম্ভ করবে তোমার শক্তি।'

একদিন সকালে প্রবীণ এক মানুষ এলেন। বললেন, 'খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছি। আমি এক কলেজের প্রিনসিপ্যাল ছিলুম। রিটায়ার করেছি। আমার আসার কারণ শুনলে, আপনি হয়তো হাসবেন; আবার নাও হাসতে পারেন; কারণ আপনারা সবই জানেন। আমার বাড়ির পাশেই একটা পার্কে ভোরবেলা বেড়াই। খুব বেশি লোকজন থাকে না। তিন দিন আগে আপন মনে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললে—কি গো, খুব তো বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো, আমাদের লেখাপড়া কে শেখাবে? ফুটফুটে একটা বাচ্চা। আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে আর বলছে—আমাদের বাপু পয়সাটয়সা নেই, এমনি পড়াতে হবে। আমাদের বাবা

নেই, মা নেই, কেউ নেই, তা হলে কি মূর্খ হয়ে থাকবো ! আমি অবাক হয়ে শিশুটিকে দেখছি আর ভাবছি, কে এই স্বর্গীয় শিশু। এমন পাকা পাকা কথা বলছে আদো-আদো গলায়। বললে, শুধু বেড়ালেই হবে ? শরীর আর ক'দিন থাকবে গো। বড় বাড়ি করেছ, টাকাও করেছ অনেক, সে-সব কি তোমার সঙ্গে যাবে বাপু ! আমার রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠল। কে এই ডেঁপো খোকা ! রাগে যেই হাত তুলেছি— দেখি কোথায় কি, কিছু দূরে ঘাসের ওপর একটা কাঠবেড়ালি, পিঁড়িক পিঁড়িক করে ন্যাজ নাচাচ্ছে। ভাবলুম চোখের ভুল, মনের ভুল, বেশ বোকা বনে গেলুম। ফিরে এলুম বাড়িতে। পরের দিন ভোরবেলা হাঁটিতে হাঁটিতে গেলুম গঙ্গার ধারে। সবে ভোরের আলো ফুটেছে। দেখি ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে সেই শিশুটি। ফুটফুটে চেহারা। আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—কই গো, কি হল তোমার ! কিছু ভাবলে আমাদের কথা ? কাল যে তোমাকে বললুম। আমি বললুম, তুমি কে বলো তো ? সে বললে, সে কি তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ? তোমার চোখে বুঝি ছানি পড়েছে ? আবার রাগে আমার সারা শরীর রি রি করে উঠল। আমি যেই হাত তুলেছি, দেখি কেউ কোথাও নেই, সামনে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা কুকুর, লেজ নাড়ছে। আমি তখন প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলুম। এ কি কাণ্ড ! ফিরে এলুম বাড়িতে। আমি কি করবো ! আমার কি-ই বা করার আছে। শেষে কাল রাতে দেখলুম স্বপ্ন। সেই শিশু। সে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিলে, কোথায় আসতে হবে, কি কি করতে হবে। তাই আমি চলে এলুম। এসে দেখছি আপনাকে। আর যতই দেখছি, ততই পালটে যাচ্ছে আমার ভেতরের চেহারা। বিশ্বাস করুন, এইটুকু সময়ের মধ্যেই বেশ যেন একটি শান্তির ভাব এসে গেছে মনে। মনে হচ্ছে, পথ হারিয়ে ছিলুম এতদিন, যেন পথ খুঁজে পেয়েছি অবশেষে। বলুন, কি করবো আমি ?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'বসুন আপনি। আপনাকে কে পাঠিয়েছেন আমি জানি। আপনি চিনতে পারলেন না ! ওই দেখুন সেই শিশুকে !'

আশ্রমের ও-পারে বিশাল তেঁতুল গাছের তলায় সত্যিই একটি ফুটফুটে বালক দাঁড়িয়ে আছে। এক মাথা চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। পরনে ছোট্ট একটা ইজের। খোলা গা। শিশুটি কোথা থেকে একখণ্ড

আখ পেয়েছে। দু'হাতে বাঁশির মতো ধরে দাঁত দিয়ে ছাল ছিঁড়ছে। এই শিশুটিকে আগে আমি দেখিনি কখনো। চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই ছেলেটি অদৃশ্য। শিক্ষক ভদ্রলোক বললেন, 'এ যেন ম্যাজিক! এই আছে, এই নেই। কে এই রহস্য বালক?'

সন্ন্যাসী আমাকে বললেন, 'একটা আয়না নিয়ে এস তো।'

আয়নাটা আনতেই, তিনি তুলে দিলেন অধ্যাপকের হাতে। বললেন, 'তাকিয়ে দেখুন। চিনতে পারছেন? কোনও মিল খুঁজে পাচ্ছেন?'

অধ্যাপক বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে এ তো আমি? এ তো আমারই শৈশব। ছেলেবেলার আমি।'

সন্ন্যাসী বললে, 'মনে পড়ে, ট্রেন দুর্ঘটনায় বাবা আর মা দুজনেই মারা যাবার পর আপনার ঠাকুমা আপনাকে এক অনাথ আশ্রমে রেখেছিলেন? সেই আশ্রম থেকে যখন আপনার ন'বছর বয়েস, তখন আপনি পালিয়েছিলেন। আপনি বড় হয়েছিলেন এক বস্তিতে। যাঁরা মানুষ করেছিলেন তাঁরা গরিব হলেও খুব ধার্মিক আর সৎ ছিলেন। মনে পড়ে কি, অবৈতনিক কোনও বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আপনাকে ঘুরতে হয়েছে বড় বড় লোকের দরজায় একটু দয়ার জন্যে? তারপর আপনি সব পরীক্ষায় প্রথম হয়ে হয়ে বৃত্তির টাকায় ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। সেই বুড়ো আর বুড়ি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনার সেবা পেয়েছেন। লড়াই করতে করতে যৌবন চলে গেছে, বিবাহ, সংসার এসব আর করাই হল না। আপনি তো সিদ্ধি লাভ করে বসে আছেন, তাই তো আপনার ইষ্ট'আপনারই শৈশবের চেহারা নিয়ে আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে—বলছে আমার সেবা করো—বহুরূপে আমি তোমার চারপাশে ছড়িয়ে আছি।'

অধ্যাপক স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তাঁর দু'চোখ দিয়ে হঠাৎ জল নেমে এল। তিনি ধরাধরা গলায় বললেন, 'কেমন করে জানলেন আমার অতীত! যেন আপনি আমার পাশে পাশে ছিলেন জীবনের এই দীর্ঘপথ। জীবনে বহুবার অবাক হয়েছি; কিন্তু এমন অবাক কোনও দিন হইনি। আপনি প্রকৃতই একজন মহাপুরুষ।'

'অত সহজেই কোনও সিদ্ধান্তে আসবেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি।

'কে কতটা তাঁর দিকে এগিয়েছে—সেইটাই হল তার বিচার।'

'আপনি অনেক দূর গেছেন। এই যে আমি বসে আছি এতক্ষণ আপনার কাছে, আমার নাকে অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ আসছে।'

'এখানে অনেক ফুল আছে, এ তো তারই গন্ধ হতে পারে।'

'না, এ ফুল ফুটেছে আপনার ভেতরে। আপনার পেছনের দেয়ালে একটা আলো পড়েছে। আপনি যেন জ্বলছেন!'

'ও বাইরের রোদের আলো ঠিকরে এসেছে।'

'আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলুম, অত সহজে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। এই যে আমি বসে আছি আপনার ভেতর থেকে কি যেন একটা আসছে আমার ভেতরে তরঙ্গের মতো।'

'ও আপনার মনের ভুল।'

'আমার মন বহুবার বহু ভুল করে এখন আর সহজে ভুল করে না। আসল, নকল চিনতে শিখেছে। আর ক'বছরই বা আছি এই পৃথিবীতে। আপনার হাতেই ছেড়ে দিলুম নিজেকে। আমি ছাড়া কেউ তো নেই আমার।'

'আহা, কি অপূর্ব উপলব্ধি।' সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার আমিটাকে আমার তুমি করাই হল সব সাধনার সেরা সাধনা।' দূরের দিকে চোখ তুলে সন্ন্যাসী বললেন, 'ও আবার কে আসে?'

দূরে কে একজন আসছেন। পরনে এক খাদি গামছা। বেশ মোটাসোটা। খালি পা, আদুর গা। উস্কোখুস্কো এক মাথা কাঁচা পাকা চুল। সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই লকাবাবু। সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লাল একটা আপেল রেখে বললেন, 'ক্যালেন্ডারে দেখুন মহারাজ। ঠিক একমাস। যা বলেছিলেন—সব দিয়ে, এমন কি পরনের শেষ কাপড়খানাও দিয়ে চলে এসেছি। এখন বলুন, আপনার আদেশ কি?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'মা কোথায়?'

'কাশী থেকে ফিরিয়ে এনে বাড়িতে বউয়ের সেবায় রেখেছি!'

'যদি না দেখে?'

'অত বোকা আমি নই। সে আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি। ফাঁকিবাজি চলবে না। তুমিই মাকে দূর করেছিলে, সেই পাপ দূর হবে এই জ্যান্ত দেবীর সেবায়। সেবা

করলে অন্ন জুটবে নয় তো ভিক্ষে।'

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে ঘরে গেলেন। ফিরে এলেন একটা ধুতি আর চাদর নিয়ে। লকাবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'যাও, প'রে এসো।'

লকাবাবু পুকুরের দিকে যেতে গিয়ে হোচট খেলেন। চোখ দুটো প্রায় গেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। আমি হাত ধরার জন্যে এগোতে যাচ্ছি সন্ন্যাসী বললেন, 'কোনও রকম সাহায্য চলবে না। নিজেকেই করতে দাও।'

আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'ইচ্ছে করলে এখনি আপনি ও'র চোখদুটো ভাল করে দিতে পারেন।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি কি ভগবান রে! খোদার ওপর খোদকারি চলে! কর্মফল ভোগ করতেই হবে। কারোর ক্ষমতা নেই খণ্ডায়!'

লকাবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যথার্থই বলেছেন মহারাজ। তবে এও আমি বলে রাখলুম নিজের জন্যে মানুষের কাছে আমি কিছুই চাইব না। বসে থাকবো তাঁর করুণার জন্যে। প্রার্থনা করবো। সেই জোরে ফেরার হলে চোখ ফিরে পাবো।'

লকাবাবু এগিয়ে চললেন সামনের দিকে টলতে টলতে।

অধ্যাপক বললেন, 'অদ্ভুত মানুষ তো! অপরিসীম মনের জোর।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'হলে এই সব মানুষেরই হয়। বিশাল ধনী। অর্থ যে-পথে আসে সেই পথেই এসেছিল। ত্যাগও হল আচমকা এক কথায়। বলেছিলুম গামছা প'রে নিঃস্ব হয়ে আসতে হবে। একমাস সময় চেয়েছিল। আজ সেই দিন। ঠিক চলে এসেছে।'

ধুতি পরে চাদর গায়ে লকাবাবু ফিরে এলেন, গামছাটা কোমরে বেঁধেছেন বেল্টের মতো। এসেই বললেন, 'আমাকে এইবার একটা ছোট হারমোনিয়ামের ব্যবস্হা করে দিন মহারাজ। বাজারের কাছে একটা চট পেতে বসে প্রভুর নাম গাইবো আর ভিক্ষা করবো এই আশ্রমের জন্যে।'

'এখন তুমি এইখানে বোসো। দেখ কে এসেছেন?'

'আমার তো খুব মজা হয়েছে মহারাজ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার, আমি তো যে-কোনও জিনিস দশটা, বারোটা দেখছি। ধোঁয়ার মধ্যে সব যেন গোল হয়ে নেচে

বেড়াচ্ছে। চোখ নয়তো সিনেমা। তা এই মহাপুরুষের নাম কি ?'

অধ্যাপক বললেন, 'আমার নাম বিনয় চট্টোপাধ্যায়। আমার নাম তো শুনলেন, আপনার নাম ?'

'আমার নাম আধপোড়া লকা।'

'সে আবার কি ?'

'আমি পুড়ে গিয়েছিলুম তাই আধপোড়া, আর এতকাল লক্কা পায়রার মতো জীবনে কাটিয়েছি তাই আমাকে লোকে বলে লকা। আর একটা পদবীও তারা যোগ করেছে শালা। তাহলে পুরো নাম হল, আধপোড়া লকা শালা।'

লকাবাবু একপাশে বসলেন জড়োসড়ো হয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলুম, মানুষটির মুখে অদ্ভুত এক পরিবর্তন এসেছে। মনে হচ্ছিল বেশ বড়সড় এক ছেলেমানুষ। একটা হাসি এসে লেগেছে মিহি আলোর মতো। দেহের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছেন জমির ওপর। মনে হচ্ছে, সহজ সরল এক মানুষ। বেশ গোছগাছ করে বসে আছেন।

সন্ন্যাসী বললে, 'অতীত ভুলতে পেরেছ ?'

'অনেকটাই। একটু আধটু লেগে আছে। বর্তমান দিয়ে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করছি।'

'চলে যাওয়া বিষয় খোঁচা মারছে ?'

'বেশ হালকা লাগছে বরং।'

'ভয় ?'

'কোনও ভয় নেই ; কারণ মনকে বেশ ভাল করে বুঝিয়েছি, ঈশ্বর এসে হাত না ধরুন মৃত্যু তো হাত বাড়িয়ে রেখেছেই। হয় সে ধরবে, এগিয়ে আসবে, না হয় আমিই যাবো এগিয়ে। এক আসনে পড়ে থাকবো সাত দিন না খেয়ে, দেহ যাবে মাটিতে, বায়ু আর প্রাণ যাবে বাতাসে।

এ দেহ কারণ কেন ভাবো মন,
পঞ্চভূতাত্মক দেহ।
প্রাণপাখী যবে ছেড়ে চলে যাবে,
ঘৃণায় ছোঁবে না কেহ।

এ সুবর্ণকায় মিশিবে ধুলায়,
চিতানলে হবে ছাই।
মায়ার কারণ এ মোহ স্বপন,
মায়ামুক্ত হও ভাই ॥'

'কোথায় পেলে তুমি এই গান ?'

'অন্নদা ঠাকুর। এতকাল আমার প্রহরী ছিল বিষয়-সম্পত্তি, টাকা, বাড়ি, গাড়ি, লোভী চাটুকার, লোক-লস্কর। এখন প্রহরী করেছি সাধু-সন্তর জীবন আর বাণী।

জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো,
সে যেন সাবধানে থাকে।
শমন আসবার পথ ঘুচেছে,
আমার মনের সন্দ ঘুচে গেছে।
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে,
চারি শিব চৌকি রয়েছে—॥'

'তা লকা তোমার গানের গলা তো ভালই।'

'আজ্ঞে মহারাজ, চোখ গেল তো ভগবান গলাটা খুলে দিলেন। সবই তিনি নিয়ে নেবেন তা তো হতে পারে না।'

'শোনো লকা, এবার একটু কাজের কথা হোক। ইনি এসেছেন। মনে আছে তোমার, ছবি বলেছিল, এমন একজন মানুষ আসবেন যাঁকে ঘিরে গড়ে উঠবে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এখন বলো দেব-মন্দির চাও না মানব-মন্দির !'

॥ দুই ॥

লকাবাবু মাথা হেঁট করে বসেছিলেন। এক মাথা কাঁচাপাকা চুল ঝুলে পড়েছে। চমকে উঠে বললেন, 'জ্ঞানের মন্দিরই মন্দির। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'কোথায় ঝাঁপাবে ?'

'আপনি যেখানে বলবেন।'

সন্ন্যাসী অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি সব ছেড়ে চলে আসতে পারবেন ?'

'এখনি, এই মুহূর্তে। আমার তো কোনও বন্ধন নেই।'

'আছে। বন্ধন আছে। আপনার পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি। যার নাম কুসুম।'

অধ্যাপক অবাক হয়ে বললেন, 'সাধু-সন্তে আমার কোনও বিশ্বাস ছিল না। ধর্মটর্ম আমি মানতুম না। আপনি আমাকে অভিভূত করে ফেললেন।'

'এই সামান্যেই অভিভূত হলেন! ঈশ্বরের এত ক্ষমতা দেখেও অভিভূত হননি এতদিন। মানুষে তার একটু প্রকাশ দেখেই টলে গেলেন !'

'কি করে এত খুঁটিনাটি আপনি বলছেন মহারাজ ?'

'আমাতে আর আপনাতে তফাৎ কোথায়? সবই তো এক। আমিটাকে ভাঙ্গতে পারলেই তো তুমি হয়ে গেল। একটু চেষ্টা করলে আপনিও পারবেন। আপনি যদি এই মুহূর্তে বাড়ি যান দেখবেন সেখানে বসে আছি আমি। বাজে কথায় কাজ নেই। আপনি ওই পালা চুকিয়ে চলে আসুন এই পালায়।'

অধ্যাপক চলে গেলেন। সন্ন্যাসী লকাবাবুকে বললেন। 'উঠে পড়ো। এখানে জাঁকিয়ে বসে থাকার জন্যে তুমি আসনি।'

'আজ্ঞে না। সে আমি জানি। জীবনের যতটুকু তলানি পড়ে আছে সেইটুকু সম্বল করেই পথের শেষ দেখার জন্য আমি ঝাঁপ মারবো।'

'পথের শেষ!' সন্ন্যাসী হাহা করে হাসলেন, 'এ কি বলে রে!

পথ কতটা জানো কি ? তুমি যদি তিন শো বছরও বাঁচো, শেষ কি দেখতে পাবে ? আর অকারণে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি ? ধরো তুমি কিছুই পাবে না। তাহলেও কি রাজি আছ ?'

'নিশ্চয় আছি। এই ইঞ্চিও যদি এগোতে পারি, তাহলেও যথেষ্ট। যতটুকু এগোবো, পরের জন্মে ততটুকুই আমার লাভ।'

'তা হলে ওঠো।'

লকাবাবুকে নিয়ে সন্ন্যাসী বাগানের এক কোণে এগিয়ে গেলেন। সেখানে একটি প্রাচীন গাছ খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। সন্ন্যাসী বললেন, 'গাছটা দেখতে পাচ্ছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। যেটুকু দৃষ্টি এখনও আছে তাতে দেখতে পাচ্ছি।'

'তা হলে শোনো, এই গাছ তোমার গুরু। এইখানে তুমি দাঁড়াও এইভাবে। একটা পা সামনে আর একটা পা পেছনে। মনে করো, তুমিও একটা গাছ। আমি চলে যাবার পর, তুমি এক মনে চিন্তা করবে এই গাছটিকে। কি চিন্তা ? আসনে স্থির হয়ে আছে এই গাছ। এর বয়েস প্রায় একশো। এই দীর্ঘ সময় এই গাছ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এ-পাশে, ও-পাশে কোনও পাশেই এর নড়ার উপায় নেই। নিজের শিকড় মাটিতে নামিয়ে নিজেকে বেঁধে ফেলেছে। ওইটাই তার সাধনা। কোনও চল-চঞ্চলতা নেই। এইবার গাছ কি করেছে ? সে জেনেছে তার গতি একমাত্র আকাশের দিকে। সে যত উঠবে তত আলো পাবে। পাবে মুক্ত বাতাস। একশো বছর ধরে সে নিজেকে বলেছে, ওঠো, আরও ওঠো, আরও, আরও। তুমি উঠতে বাধ্য। ওঠা ছাড়া তোমার গতি নেই। তাহলে গাছ তোমাকে কি শেখাবে, স্থির হও। সুস্থির। গাছ যদি ছটফট করে চলে বেড়াতো, শিকড় নড়ে যেত। ঠাঁই নাড়া হলে গাছ যেমন বাঁচে না। ছটফট করলে সাধকও তেমন আলোর সন্ধান পায় না। উঠতে হলে স্থির হতে হবে। দেহে নয় মনে। একাগ্র হতে হবে। নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে। মনকে একটা ভূমিতে বসাতে হবে। ঝড়, জল, শীত, গ্রীষ্ম সবই পার করে দিতে হবে মাথার ওপর দিয়ে। তোমার মন বিদ্রোহ করবে। তুমি পালাতে চাইবে। তখনই ভাববে আমি গাছ, আমার নড়া চলবে না। আপাতত তুমি এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকো মাটির দিকে তাকিয়ে। মনে করো এইটাই তোমার

কাজ। এইটুকু করলে তবেই তুমি খেতে পাবে। যেদিন দেখবে তোমার মাথার ওপর নির্ভয়ে পাখি এসে বসেছে। সেইদিন বুঝবে তোমার এই বৃক্ষসাধনা সফল হয়েছে। তোমার পা বেয়ে লাল পিঁপড়ে উঠবে, কামড়াবে, গায়ে মাকড়সা খেলবে, তবুও তুমি স্থির। এমন কি গা বেয়ে একটা সাপ উঠলেও তুমি নড়বে না, ভয় পাবে না। কেমন ?'

লকাবাবু বললেন, 'আমি চেষ্টা করে দেখি। হওয়া, না হওয়া, আপনার হাতে। আপনার কৃপা হলে পারবো, না হলে পারবো না।'

'তুমি খুব চালাক।'

'চালাক নই। চালাকিও ছেড়ে এসেছি। এটা আমার বিশ্বাস।'

সন্ন্যাসী লকাবাবুর মাথায় হাত রেখে জপ করে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। লকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসী যে-ভাবে দেখিয়ে গেলেন।

দুপুরের দিকে লকাবাবুর স্ত্রী এলেন হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে। বেশ বড় মাপের। লকাবাবু তখন সন্ন্যাসীর নির্দেশে বসে আছেন ঠাকুর ঘরে। পাক্কা এক ঘণ্টা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গাছতলায় মাথা নিচু করে। একটুও নড়েননি। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে গেছি দূর থেকে। সেই ঘোর তখনও লেগে আছে চোখে।

লকাবাবুর স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে। সন্ন্যাসী তখন নিজের আসনে ধ্যানস্থ। আমি বাইরে বসে কাঠ কাটছি। একটু পরেই কাঠের জ্বালে মাটির মালসায় তৈরি হবে হবিষ্য। সারাদিনে এই একবারই আহার, শেষ বেলায়, সূর্য যখন তেজ হারিয়ে নেমে পড়েছে আকাশ ঢলে। তিন আঙুলে যতটুকু ওঠে সন্ন্যাসী ঠিক তিনবার সেই পরিমাণই গ্রহণ করেন।

লকাবাবুর স্ত্রীকে বেশ ভালই দেখতে ছিল। বড়লোকের বাড়ির বউ যেমন হয়। বেশ ফর্সা। ভদ্র। সাদা লালপাড় একটা শাড়ি পরে এসেছেন। মাথায় ঘোমটা। গায়ে কোনও গয়না নেই। গোল গোল হাতে মোটা মোটা দুটো শাঁখা। লকাবাবু দেখেই উঠে এলেন বাইরে। দু'জনে চলে এলেন বকুলতলায়। লকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এইসব আবার কি নিয়ে এলে ? জেনে রাখো আমি তোমাদের আর কেউ নই। আমার মালিক বসে আছেন ওই আসনে।'

'তোমার খাবার। তুমি না খেলে মা খাবেন না।'

'মাকে গিয়ে বলো, এইসব আমি খেতে পারব না। এতে আমার কোনও অধিকার নেই। এটা আশ্রম। এটা ধর্মশালা নয় যে, যে-যার খুশি মতো বাইরে থেকে খাবার এনে খাবে। এখানে মহারাজ যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে।'

'তুমি না খেলে, আমাদের খাওয়া হবে না।'

'বুঝেছি, তোমরা হলে বটের আঠা। ছাড়ালেও ছাড়তে চাও না। সারাজীবন অনেক খেয়েছি আর কত খাবো।'

লকাবাবু টিফিন কেরিয়ারটা হাত থেকে নিয়ে চলে গেলেন একটা গাছের তলায়। আমি ভাবছি তিনি হয়তো খেতেই বসলেন, একপাশে। একে একে চারটে বাটি খুলে পাশাপাশি সাজালেন। ভাত, ডাল, তরকারি, ভাজাভুজি, চাটনি। প্রথমেই ভাতের বাটি গাছতলায় উপুড় করে দিতে গিয়েও করলেন না। কি ভাবলেন। পাশাপাশি সাজিয়ে সামনে স্থির হয়ে বসলেন। বসামাত্রই যেন ধ্যান লেগে গেল। অনেকক্ষণ বসে থেকে হাত জোড় করে বললেন, 'বৃক্ষদেবতা, তুমি গ্রহণ করো এই নিবেদন। তা না হলে আমার মা উপবাসে থাকবেন।'

বলতে বলতেই অদ্ভুত চেহারার এক ফকির আশ্রমের মাঠে এসে দাঁড়ালেন। দীন-দরিদ্র বলে মনে হল না। মনে হল বেশ মানী কোনও মানুষ। তিনি এসেই বললেন—'যাক, আজ তা হলে আল্লা এখানেই মাপালেন। তাঁর যেমন ইচ্ছা।' ফকির ঝোলা থেকে কালো রঙের একটা কাপড় বের করে জমিতে বিছিয়ে বললেন, 'মালিক, সব সাজিয়ে দাও এইখানে। ও, তোমাদের তো আবার অনেক জাতের বালাই। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে, তাই না মালিক?'

ফকির হঠাৎ গান ধরলেন অপূর্ব সুরেলা গলায়,

'যে যা ভাবে সেই রূপ সে হয়।
রাম-রহিম করিম কালা এক আত্মা জগমেয়।
কুল্লে সাঁই মোহিত খোদা।
আপনা জবানে কয় এ কথা।
যার নাইরে বিচার, বুদ্ধি নাচার।
পড়িয়ে সে গোল বাধায়॥'

এমন গলা আর এমন গান আমরা কেউ কখনও শুনিনি। মিছরির

ছুরির মতো। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার আসতে একদিন দেরি হল কেন? আমার চিঠি পাওনি?

ফকির বললেন, 'চিঠি না পেলে এলুম কি করে মালেক। দেরি আমার কারণে হয়নি। হয়েছে ট্রেনের কারণে। এলাহাবাদে আটকে গেল।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আপনি কখন চিঠি লিখলেন? আপনাকে তো চিঠি লিখতে দেখিনি।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'ও তুমি বুঝবে না। আমাদের চিঠি চালাচালি হয় বেতারে।'

সন্ন্যাসী ফকিরকে বললেন, 'এসেই ভোগে বসে গেছ? তা ভালই করেছ। শোনো. লকা, মা নিজের হাতে রেঁধে পাঠিয়েছেন। ছেলে না খেলে মা উপবাসী থাকবেন, এ তুমি ফেলে দিতে পারবে না। আজ আমরা সবাই মিলে এই ভোগই গ্রহণ করব।'

সন্ন্যাসী লকাবাবুর স্ত্রীকে বললেন, 'শোনো মা, আজ যা হল, তা হল, কাল থেকে আর এমন কোরো না। তোমার মাকে নিয়ে সঙ্ঘের দিকে একবার এসো, আমি বুঝিয়ে বলে দোবো। তোমার স্বামী এখন আমাদের পাঠশালার ছাত্র। তাকে চলতে হবে আমাদের নিয়মে।'

লকাবাবুর স্ত্রী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সন্ন্যাসীর দিকে। রোদে তাঁর শরীর যেন জ্বলছে। টানা টানা চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে কাচের মতো। লকাবাবুর স্ত্রী যেন ভগবান দেখেছেন। তিনি কেঁদে ফেললেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'যাক, ভেতরে তাহলে জল আছে এখনও। শুকিয়ে যাওনি। তোমার মঙ্গল হবে।'

লকাবাবুর স্ত্রী বললেন, 'তা হলে আরও কিছু নিয়ে আসি, তা না হলে তো সকলের হবে না।'

ফকির বললেন, 'হবে না মানে। আমরা বাড়িয়ে নোবো। জলে জল ঢালবো। তরকারিতে মিশিয়ে দোবো গাছের পাতা।'

'সে কি আর মুখে দেওয়া যাবে?'

'তাই না কি, তাহলে দেখবে মা!'

॥ তিন ॥

ফকির কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন ; তারপর সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর একটা সহজ উপায় আছে, আমার সেই ম্যাজিক। মনে আছে, কংখলে আমাদের সেই আশ্রমে একবার করেছিলুম।'

'তাহলে তো তোমার একটা বড় হাঁড়ি চাই।'

'আর চাই ছোট এক বালতি জল।'

ছবি কখন এসে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। সে ঘরের ভেতর থেকে হাঁড়ি আর এক বালতি জল নিয়ে এল। আমরা অবাক হয়ে দেখছি। কি ম্যাজিক হবে কে জানে। সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসছেন। ফকির চারটে বাটির ভাত, ডাল, তরকারি যা ছিল সব হাঁড়িতে ঢেলে হুড় হুড় করে বালতির জল ঢেলে দিলেন। তারপর একটা গাছের ডাল ভেঙে খুব করে ঘেঁটে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'যা হবার তাই হোক।' ছবিকে বললেন, 'জননী, একটা কিছু এনে হাঁড়ির মুখটা ঢেকে দিয়ে বলো, লাগ ভেলকি লাগ। আমরা হলুম বাবার চেলা, তাগ ধিনাধিন তাক্।'

মিনিট দশেক পরে ফকির বললেন, 'যাও সব কলাপাতা কেটে আনো, ভোগ লাগাই।'

সত্যি, জীবনে অমন ম্যাজিক দেখিনি। আমাদের পাতে পাতে এসে পড়ল, গরম গরম সোনার বর্ণ খিচুড়ি। কি তার সুন্দর গন্ধ। তেমনি তার স্বাদ! আমরা সবাই খাচ্ছি আর ফকির হা-হা করে হাসছেন, আর বলছেন, 'বিজ্ঞানীরা দেখলে আমাকে ছাতা পেটা করবেন। ব্যাটা তুমি ভেলকি দেখাচ্ছ? এতে তো ভেলকি নেই বাবা। প্রেম আছে। প্রেমসে মেলাও, প্রেমসে খাও, প্রেমসে প্রভুর নাম লাগাও।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'এরপর যদি গরম জিলিপি খাওয়ার ইচ্ছে করে!'

'উয়ো ভি মিলেগা। যিতনা চাহিয়ে!'

ফকির মাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জিলাবি আ যাও।'

বলতে না বলতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন গোকুলবাবা। তাঁর হাতে বিশাল এক চ্যাঙাড়ি। তিনি বললেন, 'যাক ভালই হয়েছে। আশ্রমে

আজ নতুন অতিথি এসেছেন, গরম গরম জিলিপি ভাজছিল, কি মনে হল, লোভও হল, নিয়ে এলুম।'

ফকির বললেন, 'খুব ভাল করেছেন বাবা। জিলিপি হল কুলকুণ্ডলিনী। নিন বাবা, পরিবেশন করুন।'

সন্ন্যাসী বললেন 'এটা তো বুঝলুম না ফকির, তোমার ইচ্ছের আগেই কেনা হয়ে গেল কি করে ?'

ফকির বললেন, 'হায় আল্লা, এটা বুঝলে না. আমি তো তোমার ইচ্ছেটাকেই চেপে ধরলুম। তুমি যাতে রসগোল্লা, পান্তুয়া না চেয়ে বসো। ক্ষমা কোরো প্রভু, তোমাকে কাবু করে ফেলেছি বলে রেগে যেও না।'

সন্ন্যাসী বললেন. 'তোমার সেই সম্মোহন-বিদ্যায় আমাদের কাত করে দিলে! তা ভাল। কিন্তু এইসব করে কি হয়? এই যে তোমার সূর্যসাধনায় সামান্য জল আর কিছু তরকারি মিলিয়ে তোফা খিচুড়ি করে দিলে, এও কি ধর্মসাধনার মধ্যে পড়ে! এই পথে কি তাঁকে পাওয়া যায়!'

'তুমি ঠিক বলেছে। এ সবই হল সিদ্ধাই। এই সব দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়। এর প্রয়োজন কোথায় জানো। অবিশ্বাসী মানুষকে পথে আনা। এ সব হল টোপ। এই টোপে গেঁথে আঁসটে সংসারীকে দলে ভেড়াতে হয়। বোঝাতে হয়—যাঁর পৃথিবীতে বোলচাল মারছো বাপধন, তাঁর শক্তির নস্যি পরিমাণ পেলে কি হয়। শুধু ঘরের চৌকাঠে দাঁড়ালেই দিন-কে রাত করা যায়। তাহলে ঘরে ঢুকলে কি হবে বুঝে নাও। তা হলে বুঝে নাও, তিনি হাত ধরলে তুমি কি হবে! এ আর কিছুই নয়, সেই বসন্তের টিকা দেওয়ার মতো। মেলায় প্রথমে খুব খানিক গান বাজায়। লোকজন জড়ো হয়ে গেল, তখন সরকারের লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, ধরে ধরে টিকা দেবার জন্যে। সিদ্ধাই নিয়ে পড়ে থাকতে নেই। সমুদ্রের ঢেউয়ের ছিটে গায়ে এসে লাগল। বুঝলে সামনে অসীম সমুদ্র। সাধক, মারো ঝাঁপ।'

ফকির উঠে নাচতে শুরু করলেন—

> ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন,
> তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন ॥

খ‍ুঁজে খুঁজে খুঁজে খুঁজলে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ ।।

যেমন নাচ, তাঁর তেমনি গান। আশ্রমের মাঠে ভিড় দাঁড়িয়ে গেল। সেই গানের এমনই টান আমরা স্থির থাকতে পারলুম না। সকলেই নাচতে লাগলুম ধেই ধেই করে। সেইদিন থেকেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম সৎসঙ্গের কি আনন্দ। স্বর্গ যে এখানেই নামিয়ে আনা যায়! স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তো তা আছে এই মর্তভূমে দেবতা মানুষের বিচরণ ভূমিতে। বহুক্ষণ চলল সেই নৃত্য। সন্ন্যাসী কাঁদছেন, কাঁদছেন ফকির, কাঁদছি আমরা। দুঃখে নয় আনন্দে।

অবশেষে সবাই স্থির হয়ে বসলেন। ফকিরকে ঠিক যীশুর মতো দেখতে। নেচে আর গেয়ে চোখ-মুখ লাল টকটকে। সন্ন্যাসী বললেন, 'হচ্ছে যখন হয়েই যাক। তোমার ফুলের খেলাটা একবার দেখাও।'

'ও, তুমি দেখতে চাও, শক্তিটা এখনও আমার আছে কি না। আচ্ছা, দেখাই যাক।'

ফকির আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, ওই যে ফুটে আছে, ওটা কি ফুল ?'

'কলকে ফুল।'

'বেশ, নিয়ে এসো। দেখাই যাক কলকে ফুল কি না ?'

ফুলটা পেড়ে এনে তাঁর হাতে দিলুম। ফকির হাতের মুঠোয় ফুলটা চেপে ধরে চোখ বুজোলেন। 'কিছুক্ষণ পরে মুঠো খুললেন। আমরা সকলেই হাঁ হয়ে গেলুম—ফকিরের হাতে ধবধবে সাদা একটা গোলাপ। তিনি হাসছেন আর বলছেন, 'কলকে না গোলাপ, গোলাপ না কলকে !'

আশ্রমের ত্রিসীমানায় গোলাপ গাছ নেই। কি অবাক কান্ড। ফকির বলছেন, 'কলকেই হোক আর গোলাপই হোক তাতে আমাদের কি এসে গেল। ভগবান থেকে আমরা যতটা দূরে ছিলুম ততটা দূরেই আছি। এই গোলাপকে যদি জবা করি তাতেই বা কি যায় আসে !'

ফকির আবার মুঠোয় গোলাপ নিয়ে চোখ বুজোলেন, কিছুক্ষণ পরে যেই হাত খুললেন, হাতে একটা লাল টকটকে জবা। ফকিরের মুখে লেগে আছে ফুরফুরে সুন্দর হাসি। চোখ দুটো মরকত মণির

দাঁড়িয়েছে। তারও যেন খুব দুঃখ। সেও কিছু করতে চায় মানুষটার জন্যে। ফকির কিন্তু আপন মনে হাসছেন। হঠাৎ উঠে এলেন।

ফকির লকাবাবুর হাত ধরে বকুলতলার বাঁধানো জায়গায় বসালেন। লকাবাবু তখনও হাসছেন আর বলছেন, 'চোখের বাতি একেবারেই ফিউজ হয়ে গেল মহারাজ। এইবার ঘোর অন্ধকারে সাঁতার কাটি।'

ফকির বললেন, 'সে অবশ্য মন্দ নয়। অতল সাধনায় তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরা যায়। কিন্তু বাবা, তোমার যে এখনও কাজ বাকি আছে। সেই কাজে যে চোখ দুটো চাই। তোমার ভিতরে এখনও কুড়ি বছরের দম মারা আছে। দেখা যাক কি করা যায়।'

'মহারাজ, আমার কর্মফলের আপনি কি করবেন?'

'কর্মফল আবার কি? যাঁর কর্ম তাঁরই ফল।'

ফকির ঝট করে পাশের একটা গাছ থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দু'হাতে চটকে লকাবাবুর কপালের ক্ষতস্থানে চেপে ধরলেন। লকাবাবুর মুখ দেখে মনে হল না, কোনও রকম যন্ত্রণা পেলেন। ফকির লকাবাবুর স্ত্রীকে বললেন, 'রক্তটা মুছিয়ে দাও মেয়ে।'

লকাবাবুর স্ত্রী শাড়ির আঁচল দিয়ে রক্ত মোছালেন। ফকির বললেন, 'সরো, এইবার চোখ দুটো দেখি। কটা তার ছিঁড়েছে। সবই যদি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে তাহলে কি হবে! দেখি, বাবার আমার কর্মফল।' দাড়ি ধরে লকাবাবুর মুখটা উঁচু করলেন ফকির। মাথার ওপর রোদ ঝলসানো আকাশ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে সূর্যের তীর! লকাবাবুর মুখটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফকির তাঁর চোখে আলোর রশ্মি ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও আভা কি দেখতে পাচ্ছ বাবা?'

লকাবাবু বললেন, 'পাচ্ছি মহারাজ। তবে খুব সামান্য।'

'তা হলে তো আছে। এখনও আলো আছে। তাহলে চেষ্টা করে দেখা যাক। ফকিরের কেরামতি দেখা যাক।'

॥ চার ॥

বকুলের তলায় বসে আছেন মুখ উঁচু করে অসহায় লকাবাবু। সামনে আলখাল্লা পরা সুন্দর চেহারার এক ফকির। বিশাল লম্বা। অস্বাভাবিক লম্বা। এমন লম্বা মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। আমাকে পরে একদিন বলেছিলেন, গাছ যেমন নিচের দিকে রোদ না পেলে আলোর সন্ধানে ওপর দিকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আমিও সেই রকম। কোথায় আলো, কোথায় আলো করতে করতে লম্বা হয়ে গেছি। আমি বলেছিলুম, 'কেন আমাদের চারপাশে তো প্রচুর আলো।' তিনি বলেছিলেন, 'এ আলো আলো নয়, বিষয়ীর আলো। এই আলোয় হাট বসে, কেনাবেচা হয়, তৈরি হয় দলিল-দস্তাবেজ। আসল আলো ওপরে। যে-আলো পড়ে মানুষের ভেতরে। যে-আলোয় নিজেকে চেনা যায়। মানুষ দুটো, চলা এক সঙ্গেই চলে। একটা চলা বাইরে। সে-চলা বোঝা যায়। বাজারে যায়, কাজে যায়, বন্ধু আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যায়। আর একটা চলা তার ভেতরে। সে-চলায় তার কোনও সঙ্গী নেই। সে-চলা দেখা যায় না। সে-চলার পথের শেষ নেই। যে জানে সে শুধু নিজেকে বলে—বাপু, এগিয়ে যাও। মন-কাঠুরে জঙ্গলে ঢুকেছে কাঠের সন্ধানে। বাপু, এগিয়ে যাও। বেশ এগোই। মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল। কাটতে কাটতে গলদঘর্ম। বাজারে বেচে অনেক বেশি পয়সা হল। পরের দিন জঙ্গলে এসে কাঠুরে ভাবলে, পথিক বলেছিল, এগিয়ে যাও বাপু। ভাল কথা, আজ তা হলে আর একটু এগোই। দেখি কি হয়। ও বাবা! এ যে দেখি চন্দন কাঠের বন। চন্দন। পরের দিন সে আরও খানিক দূর এগিয়ে পেয়ে গেল তামার খনি। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগল—ক্রমে ক্রমে রুপো সোনা, হীরার খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়ল। ধর্মের পথে মনকে ওই ভাবেই চালাতে হয়, কেবল এগিয়ে যাও। দেহ দিয়ে বিষয় ধরা যায়, ধর্ম নয়। বুঝলে খোকা! বিষয়ের পথ পড়ে আছে জমিতে—সোজা, লম্বা। আর আলোর পথে উঠে গেছে সোজা, লম্বা, মাথার ওপর আকাশে। ধুলো, ধোঁয়া শব্দ যেমন বাতাসের অনেক ওপরে উঠতে পারে না, সেই রকম আমাদের মনের একেবারে ওপরের

ভাগ স্থির শান্ত। সেখানে রাগ নেই, হিংসা নেই, লোভ নেই, কিছুই নেই। ধবধবে সাদা যেন দুধের মহাদেব। কিন্তু! এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে—নাক তেরে কেটে তাক বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজানো কঠিন। তুমি শুনলে, তুমি ভুললে, মিটে গেল সব ঝামেলা। সংসারে কুম্ভীপাকে ঘুরে ঘুরে মুখে গ্যাঁজলা তুলে গোরে চলে গেলে।'

আমার সেই ফকিরের কথা একশো ভাগ সত্য। কি কঠিন কাজ এই মনকে মাত্র ইঞ্চিখানেক ওপরে তোলা। এক মন বোঝা আমি মাথায় তুলতে পারি, মনটাকে ঠেলে এক সুতো ওপরে তুলতে ধেড়িয়ে যাই।

বিশাল লম্বা ফকির, যাঁর কাছে গেলে নাকে লাগে সুন্দর একটা গন্ধ—আতরের মতো, তিনি লকাবাবুর চোখ নিয়ে পড়েছেন। চোখ থেকে হাত সরিয়ে বললেন, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি, হতেও পারে নাও পারে। যদি না হয়?'

'না হলে, না হবে। আমার কাঁচকলা। যার পকেট মার হয়ে গেছে, সে তো জানেই, ফিরে আর পাবো না। দৈবাৎ ফিরে পেলে খুব মিষ্টিটিষ্টি খাওয়ায়।'

'শোনো বাবা, এতে অলৌকিক কোনও ব্যাপার নেই। বিজ্ঞান থাকলেও থাকতে পারে। তবে যোগ একটু আছে। আছে গুরুর শিক্ষা। সুতো ছিঁড়ে গেলে যেমন গাঁট বাঁধা হয়, ঠিক সেই রকম একটা কায়দা।'

'কেন আমাকে অত করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন মহাপুরুষ! সত্যি বলছি, আমি ভোগের মতো নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছি। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে? যা করার আপনি করে ফেলুন!'

'তা হলে দেখাই যাক।'

ফকির লকাবাবুর দু চোখে বুড়ো আঙুল দুটো রাখলেন। আমি পাশ থেকে দেখছি। বেশ ভয়ে ভয়ে। ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছেন ফকির। আঙুলের চাপ। লকাবাবুকে বলছেন, 'দুই ভুরুর মাঝখানে ঠিক নাকের ওপরে কপালে দৃষ্টি রাখ বাবাজী। আর কোনও দিকে নয়।'

ফকিরবাবা বুড়ো আঙুলের কি একটা কায়দা করে আঙুল সরিয়ে নিলেন। যখন করছিলেন, তখন ঠোঁট দুটো বিড়বিড় করে নড়ছিল।

লকাবাবু তাকালেন।

আমার নিশ্বাস আর পড়ছে না। কি হয় কি হয়!

লকাবাবু হাহা করে হেসে উঠলেন—'আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। জয় ভগবান। জয়, জয় ভগবান।

ফকির বললেন, 'তোমার চোখে কিন্তু ছানি আসছে বাবাজী। পরে তোলাতে হবে।'

'এখনও আপনি, তখনও আপনি।'

'বাবা, এ হল দেহবিজ্ঞান। কোনও বুজরুকি, ভেলকি তো চলবে না। তোমার চোখ দুটোকে আপাতত ঠেকে ঘুরিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। তুমিও রোজ একবার করে এই ক্রিয়াটি করবে। পরে একান্তে তোমাকে বলে দোব। কোন আসনে বসবে, শ্বাস নেওয়া ধরা, আঙুলের চাপ কোথায় কি ভাবে দেবে। এটা একটা যৌগিক ক্রিয়া। এর নাম সম্মুখী মুদ্রা। ষড়ানন যুদ্ধ-দেবতা কার্তিকের অপর নাম সন্‌মুখ। মুদ্রা মানে আটকানো, বন্ধকরা, সীলমোহর করে দেওয়া। এই মুদ্রার আর এক নাম পরাঙ্গমুখী মুদ্রা, মানে নিজের ভেতরে তাকানো। আর এক নাম শাম্ভবী মুদ্রা। শম্ভু হল শিবের নাম। শিব হলেন কার্তিকের পিতা। আবার আর এক নাম হল যোনি মুদ্রা। যোনি হল জন্মভূমি। উদ্ভব স্থান। যে ভূমি থেকে সমস্ত কিছুর উত্থান। অর্থাৎ তুমি তোমার জ্যোতির উৎসের দিকে তাকাচ্ছ। একটা আলো একটা জ্যোতি কি দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবা, জ্যোতিপুঞ্জ ঝিকমিক করছিল ভ্রূ মধ্যে।'

'ওটা তোমার ভেতরেরই আলো। ওই আলো তোমার আত্মার আলো। ওই আলো রঙ পালটাতে পারে তোমার চিন্তা অনুসারে, কালো হলেন কালী, শিব হলেন শুভ্র, নীল হলেন কৃষ্ণ। ভেতরটিকে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, পবিত্র রাখার চেষ্টা করো বাবাজী। তোমাকে এখন ভেতরের আলোতেই দেখতে হবে। সে আলোর তেল সাধনা।'

সেই আসর যেমন বসেছিল সেইরকম হঠাৎই ভেঙে গেল। গাছপালা পরিষ্কার হয়ে গেল। বসে পড়ল সেই বিশাল কুকুরটা। চেহারা বিশাল।

মুখটা কিন্তু ভারি ভালমানুষের মতো। আপন মনে বসে আছে। কুকুর যে মানুষের মতো ঢেঁকুর তোলে সেই প্রথম দেখেছিলুম। আর সেই বোধহয় শেষ।

পরে ফকির মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, আসলে কুকুর নয়, আমি ওকে চিনতে পেরেছি। ও আমারই ছায়া। আমার সঙ্গেই থাকে। আমার বিশ্বস্ততা আমার অনুসরণ একলগ্নতা ভগবতী ঘ্রাণ, ওই চেহারা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আমাকে বোঝাতে চায় আলগা দিও না, অন্যরকম হয়ে যেও না তাহলে এক আমিই তোমাকে ছিঁড়ে ফেলে দেবে। আমিও তোমার আমি। আমিই শেষ করে দেবে আমিকে।

লকাবাবু বলেছিলেন, 'মহারাজ, বিশ্বাস নেই আপনাকে। এমনও হতে পারে, রেখেছেন বাইরে সাজিয়ে উদাহরণ করে, যাতে আমরা শিখতে পারি। ডাকলে হয়তো চলে যাবে ভেতরে। এই সব আমার বোধ-বুদ্ধির বাইরে।'

ফকির বলেছিলেন, 'ধর্ম আর যাদু দুটো আলাদা ব্যাপার। দুটোকে এক করে ফেল না। সাধন ভজন করলে এক মনে মানে কায়মনোবাক্যে লেগে থাকলে একটু আধটু রূপ জ্যোতি দেখা যায়, সিদ্ধাই আসতে পারে। সেটা কিছু নয়। ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে—কিন্তু আমায় পাবে না। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে তাঁর ভাগ্নে হৃদয় একদিন বলেছিলেন, মামা! মা'র কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও। ঠাকুর বললেন, আমার বালকের স্বভাব—কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললাম, মা হৃদে বলছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অমনি দেখিয়ে দিলে, সামনে এসে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসল একটি বুড়ি বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স—ধামার মতো পেছনটা, কালাপেড়ে কাপড় পরা—শব্দ করে মলত্যাগ করছে। মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধাই হল, ওই বুড়ি বেশ্যার বিষ্ঠা।'

ফকির, সে যাই বলুন, আমি বেশ ভালভাবেই বুঝে গিয়েছিলুম, আমি কেন সকলেই বুঝেছিলেন, অসীম, অলৌকিকক্ষমতার অধিকারী। কুকুরটা সত্যিই ছিল না। এ পাড়ার ত্রিসীমানায় কেউ কখনও দেখেনি।

আমি আস্তে আস্তে কুকুরটার খুব কাছে গিয়ে মুখের সামনে বসলুম। কি যেন একটা অস্বাভাবিক। ঠিক কুকুরের মতো নয়। ভাল করে দেখতে দেখতে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, চোখ দুটো। চোখ দুটো অস্বাভাবিক। অবিকল মানুষের মতো। চোখ, চোখের পাতা, এমন কি ভুরু। কুকুর সেই মানুষের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন হাসছে! যেন চোখে চোখে জিজ্ঞেস করছে, কি কেমন আছ? তোমার নাম কি? বসে থাকতে থাকতে মনে হল, কে যেন আমার ভিতরে বসে কথা বলছে। জিজ্ঞেস করছে, কোন্ স্কুলে পড়ো? কোন্ ক্লাসে! হঠাৎ বলে উঠল, বেশ ভাল করে মাকে ধরো, বিরাট একটা ঝড় আসছে। সব ওলট-পালট করে দেবে। যে সব কথা, উপমা আমার জানা নেই, সেই উপমায় কে যেন বললে, নোঙর ছিঁড়ে সেই ঝড়ে জাহাজ বন্দর থেকে ছটকে যাবে। আবার বন্দরে ভিড়বে কিন্তু বড় দিন পরে।

আমি ভয় পেয়ে গেলুম। কুকুর যেন মানুষের মতোই মুচকি মুচকি হাসছে। আমার মনে হল অবেলায় খাওয়া হয়েছে। তাও আবার কেমন খাওয়া—ফকির সায়েবের ম্যাজিক খাবার। তার ফলেই বোধহয় আমার এমন হচ্ছে। বেলা পড়ে আসছে। লম্বা লম্বা ছায়া নেমেছে। রোদ ক্রমশই সরে যাচ্ছে দূরে। একটু আগে ছিল হাতের কাছে—এখন সেই মাঠের মাঝখানে। পালাই বাবা, বলে, উঠে দৌড় মারতে যাচ্ছি—কে যেন বললে, পালাবে কোথায়! ঘটনা থেকে কি পালানো যায়! দেহ-ঘট অবিরত নাড়ান যিনি তিনিই ঘটনা। স্থান ছেড়ে পালাতে পারবে, দেহ ছেড়ে কি পারবে! এখানেই বোসো, বসতে শেখো। সন্ন্যাসী তো তোমাকে তাই শেখাতে চাইছেন। তিনি তোমাকে সন্ন্যাসী হতে বলছেন না, বলছেন না সাধক হতে। তিনি তোমার সুতোয় দিতে চাইছেন মাঞ্জা।

'গাছ কথা বলতে পারে না কি?' প্রশ্নটা আমার মনে এল।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব শুনলুম কানের কাছে, 'পাহাড় কি কথা বলে?'

'না।'

'কিন্তু তুমি যদি পাহাড়ের কাছে গিয়ে কথা বলো, তোমার কথা তোমাকেই ফিরিয়ে দেবে পাহাড়।'

'সে তো উত্তর নয়, প্রতিধ্বনি।'

'ঠিক বলেছ। মানুষ নতুন কিছু শোনে না। সব সময় প্রতিধ্বনিই শোনে। হয় নিজের কথার, না হয় অন্যের কথার ; কারণ কথা মানুষের, ভাব ঈশ্বরের। ভাবনার উত্তর আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। ভাবতে শেখো। আর ডাকতে শেখো। আজ সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী তোমাকে একটি গল্প শোনাবেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের। সেই গল্পটা হল—আমির গল্প। আমি কি ভাবে তুমি হয়। গোরু 'হাম্বা' 'হাম্বা', আমি, আমি করে। আমি, আমি করলেই তো আমির যন্ত্রণা। গোরুকে লাঙলে জোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়, তখন খুব পেটায়। তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়ী ভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈরি হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর আমি বলে না। তখন বলে তুঁই তুঁই। মানে তুমি তুমি। এই তুমি না বলা পর্যন্ত নিস্তার নেই। এই আমি সর্বস্ব মানুষ সেই অনাদি অনন্তকাল ধরে—নিজেদের কথা নিজেদের মতো করেই বলে চলেছে। নিজের কথা বন্ধ না হলে তাঁর কথা শোনা যায় না। তিনি কথা বলেন ভিতরে বসে। অর্জুনের রথের সারথি যেমন শ্রীকৃষ্ণ। তুমি রথ। নিজে চালাবার চেষ্টা কোরো না। লাগাম ছেড়ে দাও তাঁর হাতে।

আমি কখন আবার বসে পড়েছি, সেই গাছতলায়। নিজেই অবাক হচ্ছি—এই সব কথা আমার নয়। এ সব কথা ভাব কখনো আমার মনে আসতে পারে না। অথচ এল। হঠাৎ আমার বয়েস যেন অনেক বেড়ে গেল। আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের নানা দৃশ্য দেখতে শুরু করলুম, যেন সিনেমা দেখছি। দেখছি গোকুলবাবা হঠাৎ মারা যাচ্ছেন। সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে মাটির কলসির মতো। দেখতে পাচ্ছি আমার মাকে। একগাছা পাওনাদার তাঁকে ছেঁকে ধরেছে। একে একে সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। গয়না-গাঁটি, বাসনপত্র, এমন কি বাড়িটা পর্যন্ত। দেখতে পাচ্ছি, আমাদের নিজেদের বাড়ির ছাদটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আর নিজেকে দেখলুম একটা পুঁটলি বগলে বিশাল একটা মাঠে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি ছাড়া গরুর মতো। এসব আমি কি দেখছি ? আমি কি সিদ্ধি খেয়েছি ? ফকির সায়েবের মায়া খিচুড়িতে কি নেশা হয়ে গেল আমার।

অবশেষে ভীষণ মন খারাপ করে উঠে এলুম গাছতলা থেকে। এই

সব সময়ে আমার বাবা আর মাকে ভীষণ মনে পড়ে যায়। কার কাছে যাই। কাকে জড়িয়ে ধরি। কোলে মুখ গুঁজে খুব খানিক কাঁদি। আমার পাঁচুঠাকুরও যদি থাকত! ভগবানের এতই টান যে সব ছেড়ে, সব ফেলে চলে যেতে হল। আমি তাঁর খাতায় গান লিখে দিতুম। চাঁদের আলোর রাতে আমাদের সেই নাচ আর গান। কোথায় আমার সেই ছবি! ছবির এখন কি অহঙ্কার! আবার আমার অসুখের সময় বিছানার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। তাই বা কেন? বুঝেছি এ সবই সন্ন্যাসী ঠাকুরের খেলা। আমরা বড় হচ্ছি তো, তাই একটা ছেলে আর মেয়েকে পাশাপাশি থাকতে দেবেন না। তাহলে যে মহারাজ চলে গেলেন, তিনি কেন যাবার দিন আমাদের দুজনকে দুপাশে বসিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের আমি নিবেদন করে দিলুম। সেই নিবেদন শব্দের মানেটা কি?

গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাবো তাও জানি না। হঠাৎ দেখি লকাবাবু বসে আছেন নির্জনে। ছোট্ট একটা খাতায় কিছু লিখছিলেন ধরে ধরে। চোখে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন। সে যেমনই হোক। আমাকে দেখে খাতাটা লুকিয়ে ফেলে বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় বসে কাঁদছিলে! চোখে জল! এত কান্নাকাটি করো কেন বাবা! তোমার তো কোনও কিছু হারাবার ভয় নেই। এসো আমার পাশে বোসো। সাহস পাবে। কেউ কারোর নয়, এই জপের মন্ত্রটা যখন তোমার মনে বেশ পাকা হয়ে যাবে দেখবে তখন দেখবে, একটা গোরুর মতো কেমন নিশ্চিন্তে বেঁচে আছো। বোসো, দু দণ্ড আমার পাশে বোসো। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করা যাক। কি সব ভাব আসছে, নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। একেবারে হতভম্ব। এই দেখ না কেমন লিখে ফেলেছি: দিন ছোট হয়ে আসছে। দিন মানে এই চব্বিশ ঘণ্টার দিন-রাত নয়। এক একটা মানুষ যত বছর বাঁচবে সেইটা তার দিন। সূর্যের মতই তার উদয়, মধ্য গগন, অস্তাচল। সকাল, দুপুর, সন্ধে। মানুষ নিজেই বুঝতে পারে, জীবন-সূর্য তার দিনের আকাশে কোথায় কখন আছে! তখন কি হয় বল তো? ভেতর থেকেই একজন বলতে থাকে—দুপাশে ঘন-জঙ্গল, চোর-ডাকাতের ভয়, সন্ধে হয়ে আসছে। ওরে একটু জোরে পা চালা। রাতের আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। কোনও চটি, কোনও পান্থশালা।'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন ফকির। যেন সোনার মূর্তি। তিনি বললেন, 'এই গাছতলার নাম তাহলে রাখা যাক জ্ঞানপীঠ। এইখানে এখন যে-গান চলবে তা হল--', ফকির গান ধরলেন—

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে॥

।। পাঁচ ।।

ফকির বলেছিলেন সেদিন—মানুষের একটা স্বভাবই হল, নেই কাজ তো খই ভাজ। বুড়ো বলবে, দিন ছোট হয়ে এল রে! ছোটরা সেই শুনে একটু থমকে গিয়ে ভাবতে বসবে, লোকটা বোধহয় মরবে রে! আর ফকির বলবে, পেছনে দুই লাথি। অকর্মণ্য ভ্যান্তারা ভাজার দল। মাছির মত ভ্যান ভ্যান করছে। ফকির এক ধমক মেরে বললেন—'ওঠ সব ওঠ, শিবের চেলারা। চল আমার সঙ্গে। চুপ করে বসে থাকাটাই অধর্ম। কাজই ধর্ম। একটা মিনিটও কাজ ছাড়া থাকবে না। ফাঁকে থাকে শয়তান, কাজে থাকে ভগবান। চলাপু।' এমন এক হুঙ্কার ছাড়লেন, আমরা লাফিয়ে উঠলুম।

একটা কোদাল নিয়ে এলেন ফকির মহারাজ। বললেন, 'আজ আমরা সাতটা গর্ত খুঁড়বো। সমস্ত মাটি তুলে, চেলে আবার গর্তে ফেলবো। সাতটা নারকেল চারা পোঁতা হবে। সাত বছর পরে ফল দেবে। সেইটাই হবে আমাদের ক্যালেন্ডার। সাত বছরে গাছ বড় হবে। আমাদের দেহের বয়স বাড়বে সাত। আর আমাদের মনের গাছে সাধনার ফল ধরবে। নারকেল হল সিদ্ধি। ভাইসব হাত লাগাও, ধরো কোদাল আর শাবল।'

ফকির সাহেব কোথায় কোথায় গর্ত হবে, দাগ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। খপাখপ কোদাল আর শাবল পড়তে লাগলো। প্রথমে উঠলো চাবড়া চাবড়া ঘাস। ফকির সাহেব বললেন, 'ঘাসের গন্ধ নাও, মাটির গন্ধ। এই মায়ার পৃথিবী কত কোমল। এর প্রতিটি কণায় জীবন। হাজার হাজার বছর ধরে এই মাটিতে কত জীবন এসেছে। নেচেছে, কেঁদেছে। খোল আর খোলস ফেলে চলে গেছে। প্রতি মুহূর্তে জন্মাচ্ছে লক্ষ প্রাণ, প্রতি মুহূর্তে মরছে লক্ষ প্রাণ। মারো কোদাল। গভীর আরও গভীর। নামো, নেমে যাও অতলে।' ফকির কোদাল পাড়ছেন। তাঁর গলায় দুলছে অজস্র মালা। তুলসীর মালা, স্ফটিকের মালা, রুদ্রাক্ষের মালা, হাড়ের মালা।

দু'হাত দিয়ে মাটির ঢেলা ভাঙতে ভাঙতে ফকির বললেন, 'খলিল গিবরানের কবিতা শোনো।

চলো ভাই, মাঠে যাই ফসল তোলার সময় হল।
রবির দৃষ্টিতে পাক ধরেছে শস্যে।
এসো আমরা পরিচর্যা করি পৃথিবীর ফলসম্ভারে।
প্রেম হল বীজ, আত্মা হল সার আর আনন্দ হল ফসল, হৃদয় হল জমি।
প্রকৃতির এই উৎপাদনে এসো, এসো ভরে ফেলি আমাদের গোলা
জীবন, তুমি কত বড় দাতা, প্রচুর প্রচুর দানে ভরে দাও আমাদের হৃদয়ের সাম্রাজ্য।
এসো ফুল দিয়ে রচনা করি আমাদের শয্যা, আকাশকে করি আমাদের কম্বল
এসো মাথা রাখি খড়ের বালিশে।
দিনের কর্মভার নামিয়ে এসো এবার আরাম করি।
গান শুনি পাহাড়ি নদীর স্রোতের।'

লকাবাবু শাবল দিয়ে খুপখুপ করে মাটি খুঁড়ছিলেন। বললেন, 'বাবা আপনি তো খুব শিক্ষিত মানুষ। আপনি তো যে-সে সাধু নন। আপনি মহামানব।' কথার মাঝখানেই লকাবাবু শাবল ছেড়ে উল্টে পড়লেন। ভয়ের চিৎকার—'ও রে বাবারে!'

লকাবাবুর শাবলের তলায় একটা মড়ার মাথা। ফকির উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ শরীর। ক্ষীরের মতো তাঁর গায়ের রঙ। বড় বড় মেঘবর্ণ চুল। মুখ-চোখ কাঁধ ছাপিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে। গর্তের সামনে এগিয়ে এসে একটা তালি বাজিয়ে বললেন—'এর সন্ধানেই আমি ছিলুম। কার হাতে লাগে, সেইটাই ছিল দেখার। হাত দিয়ে তোলো।'

লকাবাবু ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। মড়ার মাথাটা গর্তের ভেতর বেশ জমিয়ে বসে আছে। যেন একটু আগেই গল্প বলছিল কারোকে। মাটি সরে যাওয়ায় চুপ মেরে গেছে। লকাবাবুকে ভয়ে কাঁপতে দেখে, মড়ার মাথাটাকে আমিই তুলে আনলুম চোখের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে। কোনও ভয় করলো না। কেমন যেন একটু ঘেন্না করছিল। সবই গর্ত। মাথায় একটা তেলা হাড়ের ঢাকনা। ফকির বললেন, 'বাঃ, তোর তো দেখি খুব সাহস। তবে ঘেন্না কিসের রে! আমাদের সকলেরই মাংসের ঢাকনার তলায় এইরকমই এক খাঁচা আছে। ভাল

করে দেখ। আর লকাবাবুকে দেখাও। বাবাজী বড় ভয় পেয়েছেন।'

লকাবাবু ভয়ে ভয়ে দেখছেন। ফকির বলছেন—'মড়ার মুখের ফোকলা হাসিটা একবার দেখ। মৃত্যু কত আনন্দ দিতে পারে মানুষকে! এ হাসি আর থামবে না। বাবাজী, হাত বুলিয়ে দেখ, হাড়ের কি সুন্দর ঢালাই। আরো, আরো চারটে মুণ্ড বেরোবে আজই এখুনি, শেয়ালের, সাপের, ব্যাঙের আর খরগোসের। নরমুণ্ডুটাকে ওই বকুলতলায় রেখে এসো আগে। এসব সহজে পাওয়া যায় না ভাই।'

মুণ্ডটাকে বকুলতলায় রেখে এলুম। ফকির বললেন, 'চিনতে পারলে ভদ্রলোককে?'

'কোন ভদ্রলোক?'

'ওই যে হাসিখুশি মানুষটিকে। হাড় আছে মাংস নেই। একবারও মনে হল না, এই মাটির তলায় একটা কাটা মুণ্ড এল কোথা থেকে! মুণ্ড আছে ধড় নেই। মৃত্যুর পর না পুড়িয়ে শুধু মাথাটাকে পুঁতে রেখে গেল? নিশ্চয় কোনও খুনী। আজ রাতে তোমাদের সেই কাহিনী শোনাবো। এখন কাজ।' ফকির সাহেব এইবার হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, 'বড় হয়ে যখন শেক্সপীয়রের হ্যামলেট পড়বে তখন এক জায়গায় পাবে, ওফেলিয়া আত্মহত্যা করেছে। কবর খুঁড়তে গিয়ে উঠে এসেছে ঠিক এইরকম একটা খুলি। খুলিটা উঠে এসেছে মাটির ওপরে। হ্যামলেট বলছে—That skull had a tongue in it and could sing once. একসময় এর জিভ ছিল। গাইতে পারতো গান। হয়তো কোনও নেতার মাথা। কি কোনও সভাসদের মাথা। একসময় যে বলতো—গুড মরো সুইট লর্ড। হাউ হাস্ট দাউ গুডলর্ড!'

ফকির গাইতে লাগলেন—

> A Pick-axe and a spade, a spade
> For and a shrouding sheet
> O, a pit of clay for to be made
> For such a quest is meet,
> Dig. Dig. Dig.

কোদালটা কাঁধে নিয়ে ফকির খানিক নেচে নিলেন। লকাবাবু বললেন, 'মহারাজ। আপনি কি আনন্দ দিয়ে তৈরি?'

'আনন্দই তো সব মানুষের সাধনা। কেউ খোঁজে দেহ দিয়ে, কেউ খোঁজে মন দিয়ে। দেহের আনন্দ ভোগে। ভোগ শেষে দুর্ভোগ। শেষে অসীম ক্লান্তি। বিরক্তি। মনের আনন্দ ত্যাগে। মনের আনন্দ সাধনায়। বিষয় আশয় ফেলে দাও। ফেলে দাও আকাঙ্ক্ষা। উচ্চাশা। দেখবে সর্বত্র আনন্দ। মহানন্দ। খুব সহজ আবার ভীষণ শক্ত। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া।'

ফকির কোদাল পাড়তে শুরু করলেন। আমাদের হাত আবার চলতে শুরু করলো। সত্যি সত্যিই আরও চারটে মুণ্ড বেরোলো। ফকির যেমন বলেছিলেন। সবই খুব কাছাকাছি, কেউ যেন আমাদের জন্যে সাজিয়েই রেখেছিল। ফকির বললেন, 'কাল, আমরা এই পাঁচটা মুণ্ড দিয়ে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি করবো। আসন করে না বসলে কি সাধনা হয় বাবা!'

রাত নেমে এল। সন্ন্যাসী মহারাজ পুজোয় বসলেন। ফকির জ্বালালেন ধুনো। তাঁর ঝোলা থেকে বেরলো নানা মশলা। অপূর্ব তার গন্ধ। বাইরের দাওয়ায় বসে আছে সেই ভাল মানুষ কুকুর। যেই আরতি শুরু হল, কুকুর এমনভাবে ডাকতে শুরু করলো, যেন শাঁখ বাজাচ্ছে। ফকির কালো রঙের বিশাল একটা চামর দোলাতে শুরু করলেন। বাইরের হু হু বাতাসে গাছের ঝরা পাতা উড়ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন ঘুঙুর পায়ে হাঁটছে। হঠাৎ দেখি সন্ন্যাসী মহারাজ আসনে নেই। শুধু পঞ্চপ্রদীপের পাচটি শিখা হীরের মতো বাতাসে নাচছে দুলে দুলে। এইবার আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। ভয়ে লকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলুম। তিনি ফিসফিস করে আমাকে বললেন, 'বোকা ছেলে, ভয় পাচ্ছ কেন? এ কোনও ভূতপ্রেতের ব্যাপার নয়। এ হল মহাসাধকের সাধনা। আমার কি মনে হয় জানো, মহারাজ সূক্ষ্ম হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এও এক ধরনের সিদ্ধাই। মহাভাগ্য আমাদের, এইসব দেখার সুযোগ করে দিচ্ছেন তিনি।' ফকির চামর দোলাচ্ছেন। মাঝে মাঝে খেলে যাচ্ছে আগুনের হিলহিলে শিখা। আমার ডানপাশে বসে আছেন গোকুলবাবা। দেখে শুনে পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গেছেন। অবাক হয়ে দেখছি, ধুনোর ধোঁয়া ঘরের আকাশে পাক খাচ্ছে আর বড় ছোট নানা আকারের ওঁকার তৈরি হচ্ছে। আরতি শেষ হতেই দেখি সন্ন্যাসী মহারাজ আসনেই বসে আছেন।

তাহলে আমি কি দেখলুম। সবই কি চোখের ভুল। ফকির মহারাজ ঝপাক ঝপাক করে আমাদের গায়ে চামর মারতে লাগলেন। ভীষণ গরম। আগুনের লিকলিকে জিভের মতো। মারছেন আর বলছেন, 'সব আপদ বালাই দূর হয়ে যাক।'

আরতি আর পুজো দেখতে কিছু বাইরের উটকো লোক এসে বসেছিল। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'ম্যাজিকটা বেশ ভালোই হল।'

সন্ন্যাসী মহারাজ তখনও ধ্যানেই। অশ্রদ্ধার কথাটা আমরাই শুনলুম। ফকিরও শুনলেন। তিনি সেই কালো মতো লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাল লেগেছে মহারাজ?'

'খুব ভাল, তবে প্রণামী-ট্রণামী দিতে পারবো না ফকির। ওসব ভেলকি দেখিয়ে রোজগারের ধান্দা ছাড়ো। খেটে খাও। খেটে।'

'আমাদের খাওয়ার অভাব নেই মহারাজ। তোমাকে প্রণামী দিতে হবে না। তুমি বরং একটু প্রসাদ পেয়ে যাও।'

'প্রসাদ?' লোকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'আপনি পায় না খেতে, বলে শংকরাকে ডাক।'

ফকির বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। তবে তোমাকে দিলেও খেতে পারবে না মহারাজ। তোমার যে চোয়াল আটকে গেছে।'

লোকটা উত্তর দেবার জন্যে হাঁ করেছিল। সেই যে হাঁ করল, চোয়াল আর বোজে না। যন্ত্রণায় আঁ, আঁ করতে লাগল। ফকির বললেন, 'যাঃ, সত্যিই আটকে গেল রে বাবা। কত উপদেশ দিচ্ছিল ওই মুখ। এই তো কয়েক মিনিট আগে। আহা মানুষের শরীর! কখন কি যে হয়! যাও বাছা, হাসপাতালে গিয়ে তালা খুলিয়ে এস। দেখ তো কি কাণ্ড! অত হাঁ করে করে কথা বলতে আছে! এখন আবার যদি পা দুটো পড়ে যায় তাহলে কি হবে! আর চোখে যদি আলকাতরার অন্ধকার দেখ বাবা! আমি জানি না বাবা! এসব কি হচ্ছে। আমরা ম্যাজিক জানি! ম্যাজিক করেই গাঁজা-ভাঙ খাই। আমরা তো আর ডাক্তার নই।'

লোকটা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল।

ফকির সাহেব বললেন, 'কি কাণ্ড! সত্যি সত্যিই পা দুটো পড়ে

গেল। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে বাবা। এই তোমার শেষ ওঠা না কি!'

মাটিতে পড়ে লোকটা দু'হাত দিয়ে একটা কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে আর মুখে হাউ হাউ করে কান্নার মতো শব্দ। ফকির সায়েব দু'পা এগিয়ে এসে বললেন, 'ও দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারিনি। এ যে একটা থুত্থুড়ে বুড়ো।' আমরা সবাই অবাক। কালো, কুচকুচে জোয়ান লোকটা মাটিতে পড়ে আছে, যেন একশো বছরের একটা বুড়ো। সাদা শনের মতো চুল। ফ্যালফেলে, মরা মরা দুটো চোখ। গায়ের চামড়া গিলে করা পাঞ্জাবির মতো কুঁচকে মুচকে গেছে। ফকির বললেন, 'ছি ছি, তোমার বাড়ির লোকজন কেমন বাপু, এই বয়সে অন্ধ মানুষটাকে একা একা বাড়ির বাইরে ছেড়ে দিয়েছে।'

পাশ থেকে আর একটা লোক ঝপাং করে ফকিরের পায়ের ওপর এসে পড়ল। 'বাবা, রক্ষা করো। জানে মেরে দিও না। ওর হঠাৎ পয়সা হয়েছে তো। তাই বড়-ছোট কথা বলে। কাকে কি বলতে হয় জানে না! বাবা রক্ষা করো।'

ফকির বললেন, 'আরে করো কি? পায়ে ধরছ কেন বাবা। কেন আমাকে পাপের ভাগী করছো। বড় মানুষের কি উচিত ছোট মানুষের পায়ে ধরা! আমার কী দোষ বাবা। বুড়ো মানুষের চোয়াল আটকাতেই পারে। পক্ষাঘাতও হতে পারে। ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও। হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমি কি করব বলো! আমরা জোচ্চর লোক। ধর্মের নামে ম্যাজিক দেখিয়ে কলাটা মুলোটা রোজগার করি। যেদিন পুলিসে ধরবে সেইদিন বেরিয়ে যাবে কেরামতি।'

লোকটা তবুও পা ছাড়ল না। বলতে লাগল, 'বাবা, তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি তুক করেছ।'

সর্বনাশ হয়ে গেল, এই একটি কথায়। ফকির বললেন, 'ও, তুমি তো তাহলে সর্বজ্ঞ। সবই জানো। তাহলে কোনও ওঝা ডেকে এনে তোমার রহিশ আদমিটিকে ভাল করে তোলো। আমার কাছে কেন বাবা!'

সাধু মহারাজ আসন ছেড়ে উঠে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নিয়ে অশান্তি!'

'একটা বুড়ো গালাগাল দিতে দিতে উল্টে পড়ে গেছে।'

সেই লোকটা ফকিরের পা ছেড়ে সাধু মহারাজের পা জড়িয়ে ধরল, 'বাবা জোয়ান আদমি, চোখের সামনে দেখতে দেখতে এইরকম হয়ে গেল ফকিরবাবার কারসাজিতে। মহারাজ আপনি বাঁচান।'

'আমি কে বাবা? সামান্য মানুষ। আমার কতটুকু ক্ষমতা! ভগবানকে ডাকো।'

লোকটা আবার ভোঁ ভোঁ করে কাঁদতে লাগল, 'মহারাজ, এ আমার ভগিনীপতি। এই তিন মাস হল বিয়ে হয়েছে।'

'সে কি বাবা, জেনেশুনে একটা বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে!'

বুড়োটা এইবার গড়াতে গড়াতে, কোনও রকমে ফকিরবাবার পায়ের কাছে এসে জন্তুর মতো শব্দ করতে লাগল।

ফকির বললেন, 'ওঠো, উঠে বোসো। নিজের শেষটা দেখে নিলে তো? ঠিক এইরকমই হবে বাবাজি। আমাদের কারোর কিছু করার নেই। তোমার কর্মফল।'

লোকটা উঠে বসল। আবার সে আগের মতোই হয়ে গেছে। কালো, মিশমিশে, জোয়ান একটা লোক। গুলি-গুলি, লাল লাল দুটো চোখ।

ফকির বললেন, 'ছানার কারবারে দুটো পয়সা করে ধরাকে সরা জ্ঞান। যা হতভাগা! তোর ওই খোলামকুঁচি টাকা সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

॥ ছয় ॥

লোকটির যেন পুনর্জন্ম হল। কেমন যেন অবাক হয়ে গেছে। চারপাশে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। আমি ভেবেছিলাম বদমাইশ লোক, হয়তো এখুনি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে শুরু করবে। অনেক পয়সা লোকটার। পয়সায় একেবারে পচে আছে। গা দিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে. পচাপচা। এমন লোক দেখলে ঠাকুর আপনিও সহ্য করতে পারতেন না। আমার মনে আছে সেই ঘটনা। আপনি একদিন বলছিলেন ভক্তদের ঃ

এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে ; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি। এইসব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে টান দিতে থাকবে। টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়। সে মানুষ থাকে না। এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া করত। সে বাইরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যেই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধহয় হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বল্ছে,—কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন ? তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললুম—ওরে হৃদে ! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এইরকম কথা। হৃদে হাসতে লাগল। একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বললে, তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্ ! টাকার এত অহংকার !

মনে পড়ে ঠাকুর, সুরেশ মিত্তির মশায়ের বাড়িতে কি হয়েছিল একদিন। আপনি মাঝে মাঝেই সেই বাড়িতে যেতেন, আর অমনি

আনন্দের হাটবাজার বসে যেত। সেই বাড়ির এক ভদ্রলোক উচ্চ সরকারি চাকরি করতেন। একদিন আপনাকে দেখে সেই ভদ্রলোক খুব মাতব্বরী চালে বলতে লাগলেন—'সুরেশ মিত্তির এক পরমহংস গুরু খুঁজে পেয়েছে বটে। যেমন কাণ্ড! থেকে থেকেই দক্ষিণেশ্বর দৌড়চ্ছে। আবার সঙ্গে যাচ্ছে নানারকম জিনিস। শিমলার রাম ডাক্তার, নরেন্দ্রনাথ আরো অনেকে দলে ভিড়েছে। পরমহংস মশাই ছোট ছেলেগুলিকে বখাচ্ছেন, নষ্ট করছেন। একটা অকর্মণ্য লোক, কোনও কাজকর্ম নেই।' আপনাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলছিলেন। আপনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। আপনি প্রশ্ন করলেন—'তুমি কি কাজ করো?' তিনি অমনি বুক চিতিয়ে গর্বিতভাবে উত্তর দিলেন —'আমি জগতের হিত করি।' উত্তর শোনা মাত্রই আপনি অন্যরকম হয়ে গেলেন। আপনার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই তেজোময় পুরুষ। আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন আপনি—'কি বললে? যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, তিনি কিছু বোঝেন না—তুমি সামান্য মানুষ, তুমি জগতের হিত করছ? স্রষ্টার চেয়ে তুমি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ!' ভদ্রলোক পরে একেবারে চুপসে গেলেন। রাস্তায় বেরোলেই লোকে ঠাট্টা করে বলত—'কি হে জগতের হিত করতে চললে!'

এই বেঁটে বক্কেশ্বরেরও সেই একই অবস্থা হল। ফকির মহারাজ অহংকারের পুতুলটাকে একেবারে চুরমার করে দিলেন। লোকটি হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ, আপনাকে আমার চিনতে ভুল হয়েছিল। এখন রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন। আপনার হাতে আমার মরেও সুখ। আমি উদ্ধার পেয়ে যাবো। আমার যাতে সব চলে যায়, সেই ব্যবস্থাই করে দিন।'

লোকটির মুখে আলো এসে পড়েছে। গাল বেয়ে চোখের জল নেমেছে। করুণ মুখ। দেখে আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল। কেন বাবা তুমি যা-তা বলতে গেলে? কি দরকার ছিল! তোমার ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই যখন, কি দরকার ছিল মজা দেখতে আসার!

লোকটি বলতে লাগল, 'মহারাজ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হয়। ফকির থেকে আমির। আবার আমির থেকে ফকির! এখন আপনার যেমন ইচ্ছা! মূর্খ মানুষ আমি। আমার বোঝবার ক্ষমতা কতটুকু।

তবে এইটুকু জানি, আপনি যখন আমাকে ধরেছেন, আমার আর নিস্তার নেই। আবার এও জানি, ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে। আমার বাবা একটা গল্প বলতেন, নারায়ণ এসে নারায়ণীকে বললেন, অমুকের গরুটা মেরে দিয়ে এলুম আর অমুককে বলে এলুম, তুমি ধনে-জনে আরো বড় হও। নারায়ণী বললেন, প্রভু! এ আপনার কেমন বিচার! যার একমাত্র সম্বল ওই গরুটি, সে যে আপনার পরম ভক্ত। উদয়াস্ত আপনাকেই ডাকে। নির্জনে বসে কাঁদে। আর যাকে বড়লোক করে এলেন, সে তো এক পাষণ্ড। অত্যাচারী বদমাশ চরিত্রহীন। নারায়ণ বললেন, সেই জন্যেই তো। ও বিষয়ে মজে থাক আর যার বেঁচে থাকার শেষ সম্বল ছিল গরু, তাকে আমি আরও কাছে টেনে নিলুম। আমি ছাড়া তার আর কেউ রইল না। এইবার বলো বিচারে কোনও ভুল হল কি! নারায়ণী হাসলেন। মহারাজ আপনি আমার সেই নারায়ণ!'

লোকটি হাত জোড় করে বসে পড়ল।

সাধুমহারাজ বললেন, 'এইবার কি করবে করো। এইবার তো তুমিই বিপদে পড়ে গেলে!'

ফকির জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'

'বিশ্বনাথ। আপনি আমাকে বিশে বলেই ডাকবেন।'

'শোনো বিশ্বনাথ, কাল থেকে এখানে অতিথিনারায়ণ সেবা হবে। দায়িত্ব তোমার। রোজ একশো জনের ভার তোমাকে নিতে হবে। এই সেবা যতদিন তুমি চালাবে, ততদিন তোমার কিছু হবে না। বন্ধ করলেই মরবে।'

'তাই হবে মহারাজ। তবে আমি কিছু চাই।'

'বলো কি চাও?'

'কৃপা। কৃপা চাই। মুক্তি চাই।'

'এখনও সময় আসেনি। সাত বছর পরে তোমাকে কৃপা করবেন এই বৈষ্ণব গুরু। আজ থেকে ছ'বছর পরে তোমার স্ত্রী বিয়োগ হবে। তোমার সংসার দেখবে তোমার বড় ছেলের বউ। এরই মাঝে তিন রাত তোমার হাজতবাস হবে।'

'আর কিছু মহারাজ!'

'আরো চাই?'

'আপনি যত পারেন দিন, মায়ের দয়ার মতো।'

'তাহলে তোমাকে একটা মহাস্ত্র দি—সহ্যশক্তি।'

'তারপর?'

'এরপর তো আর তারপর থাকে না!'

'থাকে মহারাজ। আমি যে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি বিদায় করতে চাইলেও আমি যে যাব না। আপনাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।'

'যা হয় না, তা হয় না।'

'তাহলে আমি এই বসলুম। বিশেকে আপনি চেনেন না। আমি ধরতে জানি ছাড়তে জানি না। আমার আর এক নাম বিশে রোকা। আর এক নাম গোঁয়ার গোবিন্দ। এই রোকের জোরেই আমি আস্তাবল থেকে প্রাসাদে উঠেছি। আমার বাবা ছিলেন গাড়োয়ান। আমাকে শেখাতেন গাড়োয়ানের ছেলে গাড়োয়ানই হয়। আমার রোক বললে, না, সব সময় তা হয় না। অন্য রকমও হয়। আমি উঠবো। এখনও আমি উঠবো। এবার আর দেহে নয়, মনে। আপনি আমার বিষয়-আশয় সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিন। একেবারে ভিকিরি করে দিন। আজই, এখুনি। আপনি সব পারেন। আমিও সব পারি। জীবনে বহু লোককে মদ খাইয়ে মাতাল করেছি, নিজে ছুঁইনি। বহু লোকের বিয়ে দিয়েছি নিজে বিয়ে করলেও ছুঁইনি। চারপাশে অনেক ভোগ সাজিয়ে রেখেছি, কিন্তু নিজে ভুঁয়ে বসে ডাল-ভাত ছাড়া কিছু খাই না। মহারাজ আমাকে আপনি কিসের ভয় দেখান। আমি রঙের ঘরে বসে আছি, রঙ লাগেনি গায়ে।'

ফকির বললেন, 'তা তো হল, তুমি এখন যাও।'

'যাও বললেই কি যাওয়া যায় মহারাজ! আমি যে আটকে গেছি। চিটে গুড়ে মাছি যে-ভাবে আটকে যায়। আমি তো আর নড়ছি না সহজে।'

সাধু মহারাজ বললেন, 'নাও ফকির, তোমার ফাঁদেই তুমি পড়ে গেছ। তোমার অবস্থা সেই যমরাজের মতোই হল। গল্পটা তাহলে শোনো।'

আমরা সবাই বসে পড়লুম। লকাবাবু বললেন, 'তাহলে একটা ধুনি তৈরি করি, তা না হলে সাধুসঙ্গ জমবে না।'

সাধু মহারাজ বললেন, 'বেশ, তৈরি করো।'

কাঠের তো অভাব নেই। হাতে হাতে সব হয়ে গেল। ধুনি জ্বলে উঠল। গাছের ছায়া কাঁপছে, কাঁপছে আমাদের ছায়া। আগুনের ফুলকি উড়ছে বাতাসে। ফকির আবার ধুনিতে কি এক মুঠো গুঁড়ো ফেলে দিলেন। অপূর্ব গন্ধে ভরে গেল চারপাশ।

সাধু মহারাজ শুরু করলেন গল্প—

এক শহরে এক ধনী মানুষ ছিল। তার চরিত্রটা তেমন ভাল ছিল না। সে ছিল বেশ্যাসক্ত। সন্ধে হলে সে আর ঘরে থাকতে পারত না। নানা রকম ভাল ভাল, দামি দামি উপহার নিয়ে সে চলে যেত তার আসক্তির জায়গায়। এই বদ অভ্যাসের ফলে জীবনের শেষ দিকে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। আজ হীরের নেকলেস, কাল সোনার নেকলেস, এই ভাবে দিতে দিতে সে ফতুর। তবু নেশা তার গেল না। সেই বৃদ্ধ একদিন দেখলে তার পকেটে মাত্র একটা টাকা পড়ে আছে। অথচ যেতে হবে। শুধু হাতে তো আর যাওয়া যায় না। মহা দুশ্চিন্তা। এই সামান্য পয়সায় কি উপহার কেনা যায়। অনেক ভেবে ঠিক করলে, সামনেই একটা ফুলের দোকান, সেই দোকানে কাঠিতে জড়ানো গোলাপ ফুল বিক্রি হচ্ছে। সেই ফুলই একটা কেনা যাক। শেষ টাকাটি দিয়ে সে একটা গোলাপ কিনল। বৃদ্ধ চলেছে। হাতে গোলাপ। সামনেই একটা নালা। নালাটা পেরোতে হবে। এমনি পেরনো যাবে না। লাফাতে হবে। বৃদ্ধ লাফ মারল। নালার ওদিকে পড়ে সে আর টাল সামলাতে পারল না। দেহটাকে কোনও রকমে সামলাতে পারলেও, ফুলটাকে সামলাতে পারল না। ফুলটা পড়ে গেল নালায়। বৃদ্ধের মনটা খারাপ হয়ে গেল। খালি হাতেই যেতে হবে। ফুলটা যখন পড়েই গেল, তখন বলা যাক, কৃষ্ণায় নমঃ। ওই যেমন বলে আর কি, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। সে বলে দিলে, কৃষ্ণায় নমঃ। ফুল ভেসে চলে গেল। সে চলে গেল তার নিজের জায়গায়। সেই রাতেই তার মৃত্যু হল বেশ্যার ঘরে। যমদূতেরা এসে তাকে নিয়ে গেল যমালয়ে। যম বললেন—'চিত্রগুপ্ত এর পাপ-পুণ্যের হিসেবটা একবার দেখ তো।'

চিত্রগুপ্ত উল্টে-পাল্টে বললেন—'মহারাজ, এর পুণ্যের ঘর একবারে খালি। কিছুই জমা পড়েনি। কেবল পাপ আর পাপ। সারা জীবনটা

শুধু পাপ।'

ধর্মরাজ বললেন, 'ভাল করে দেখ। ভারতবর্ষে জন্মেছে, একটুও পুণ্য নেই, তা কখনও হতে পারে। দেখ, দেখ, ভাল করে আবার দেখ।'

চিত্রগুপ্ত খুব খুঁটিয়ে দেখে বললেন—'মহারাজ! সবটাই পাপ, তবে টেনে টুনে এক ফোঁটা পুণ্য হয়তো বের করা যায়।'

'বলো, বলো, কি সেটা।' যমরাজ যেন অন্ধকারে আলো দেখলেন।

চিত্রগুপ্ত বললে, 'জীবনের শেষ দিনে এ বেরিয়েছিল বেশ্যালয়ে যাবে বলে। হাতে একটি গোলাপ ছিল। গোলাপটি বেশ্যাকে দেবে বলেই নিয়ে যাচ্ছিল। একটা নালা টপকাতে গিয়ে গোলাপটি পড়ে গেল নালার জলে। তখন এ বলেছিল—কৃষ্ণায় নমঃ। এখন এটাকে পুণ্য বলা যায় কি না, আপনিই বিচার করুন।'

যমরাজ বললেন, 'অবশ্যই পুণ্য। খুবই সামান্য। তা হলেও এর ফল ও পাবে। এই যমালয়ের গোলাপ বাগানে ওকে পাঁচ মিনিটের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপরই হবে অনন্ত নরকবাস। এখন জিজ্ঞেস করো কোন্‌টা আগে নেবে।'

লোকটি বললে, 'খুচরোটা আগে সেরে যাই মহারাজ। পাঁচ মিনিটে পুণ্যভোগ। তারপর তো নরকভোগ আছেই।'

যমদূতেরা তখন লোকটিকে গোলাপ বাগানে নিয়ে-গিয়ে ছেড়ে দিল। বললে, 'পাঁচ মিনিট মাত্র সময়। যা পারো করে নাও।'

লোকটি তখন করল কি? এক খণ্ড বাঁশ পড়েছিল বাগানে। সেইটাকে ফেঁড়ে দু'খণ্ড করে বেশ ধারালো দুটো ছুরির মতো টুকরো বের করে ফেলল। দু'পাশে গোলাপের সারি আর মাঝখানে সরু পথ। সেই পথ ধরে লোকটি ছুটছে আর কাঁচির মতো করে বাঁশের ধারালো খণ্ড দিয়ে ফুলের বোঁটা কাটছে। ফুলগুলো কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে, লোকটি ছুটছে আর বলছে—'কৃষ্ণায় নমঃ কৃষ্ণায় নমঃ।' ফুলেরও শেষ নেই, বলারও শেষ নেই। পাঁচ মিনিট পরে যমদূতেরা এসেছে, নরকে নিয়ে যাবে। তাদের তো চক্ষুস্থির। এ কি কাণ্ড। তারা ফিরে গেল ধর্মরাজের কাছে—'মহারাজ সাংঘাতিক কাণ্ড। সেই পাপী ফুলের বাগানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাঁশের ছুরি দিয়ে ফুল কেটে কেটে ফেলছে আর অনর্গল বলে চলেছে—কৃষ্ণায় নমঃ, কৃষ্ণায় নমঃ।'

ধর্মরাজ মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন, আর কি একে নরকে পাঠান চলবে। ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে –'বিধান দিন, এক পাপী যমালয়ে এসে অনেকবার কৃষ্ণায় নমঃ বলেছে। তাকে কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করান যাবে!'

ব্রহ্মাও বিপদে পড়লেন—'তাই তো, ভারতে ধর্মযাজনের ফলের কথা বলা আছে, যমালয়ে ধর্মযাজন করার ফলের কথা তো বলা নেই। আমার মাথায় আসছে না। চলো, দু'জনে মিলে যাই। যাঁর নাম তাঁর কাছে যাই চলো।'

বৈকুণ্ঠে গেলেন যম আর ব্রহ্মা। দু'জনকে একসঙ্গে দেখে ভগবান হাসছেন মিটিমিটি। ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন, 'ব্রহ্মা! তুমি বেদবক্তা ঠিকই। তোমারই বেদ, কিন্তু তুমি বেদজ্ঞ নও। সব ধর্মের বিধান ভারতবর্ষে আচরণ করতে হবে, একমাত্র আমার নাম ছাড়া। আমার নাম যে কোন জায়গায় যে কোনও অবস্থায় করলেই ফল ফলবে। দেশ কাল পাত্র কোনও নিয়ম নেই, কোনও বাধা নেই।

ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ বিশেষশ্চ শ্রীহরের্নাম্নিলুব্ধক॥'

সন্ন্যাসী মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন 'ফকির, এই হল গল্প। তোমার আজকের অবস্থা ওই যমরাজের মতোই। ভগবানের বিধান শুনলে। এইবার ব্যবস্থা করো। আমার তো মনে হচ্ছে বিশুবাবাজী অষ্টধাতু দিয়ে গড়া। সহজে টসকাবার নয়। একে তুলে নাও ঝেড়ে ঝুড়ে।'

ফকির বললেন, 'সবই হল, এখনও একটু বাকি আছে। তিনটে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়।'

সাধু মহারাজ বললেন, 'কখন নেবে সেই পরীক্ষা?'

বিশুবাবু বললেন, 'এখুনি, এই মুহূর্তে।'

ধুনির আগুনের লাল আভা নাচছে ফকিরের কাচের মতো মুখে। সোজা হয়ে বসে আছেন। হাঁটুতে দু'হাত রেখে। ফকির বললেন, 'বেশ, তাহলে, লজ্জা আর ভয়, দুটো পরীক্ষা একসঙ্গে হোক। ঘৃণার পরীক্ষা হবে ভোরে। বিশু, তুমি প্রস্তুত!'

'প্রস্তুত, মহারাজ।'

।। সাত ।।

লকলক করে ধুনি। আগুনের শত ছটা যেন বাতাসে চাটছে। ফকির মহারাজ বললেন, 'বিশু, তোমার সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেল।'

বিশুবাবু সঙ্গে সঙ্গে কাপড়-জামা খুলতে শুরু করলেন।

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'তোমার লজ্জা করছে না।'

বিশু বললেন, 'আদেশ আপনার, আমি মানবো। সেখানে লজ্জা আমার বাধা হবে কেন?'

সম্পূর্ণ উলঙ্গ বিশু ধুনির সামনে। নিমেষে তাঁর দেহের রঙ পালটে পেতলের মতো হয়ে গেল। লকাবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'জয় বাবার জয়।'

ফকির বললেন, 'বিশু, ধুনি থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠ তোলো।'

মনে মনে ভাবছি, কি সর্বনাশ। মানুষটা এইবার পুড়ে-ঝুড়ে খুন হবে। বিশুবাবু ডানহাত দিয়ে জ্বলন্ত একটা কাঠ তুলে নিলেন। আগুনের রঙ সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। একেবারে নীল, যেন নীলজলের ফোয়ারা। ফকির বললেন, 'নিজের শরীরে বোলাও।'

বিশু সারা শরীরে সেই আগুন ছোঁয়াতে লাগলেন। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে কাঁচের মানুষ। নীলার মানুষ। লকাবাবু ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কানে কানে বললেন, 'কি সব হচ্ছে বাবা! কত ভাগ্য করলে মানুষ এইসব দেখতে পায়। আমার এত দিনের বাঁচাটা সার্থক হল। জয় বাবা মথুরানাথ।' লকাবাবু হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। গুমরে গুমরে কান্না, 'আমার চেয়ে বিশুর বরাত কতো ভাল। বিশু সব পেয়ে গেল, আমি কিছুই পেলুম না।'

বিশুবাবু কি পাচ্ছেন?. বিশুবাবুর ভেতরে কি হচ্ছে বিশুবাবুই জানেন। অসম্ভব একটা কিছু হচ্ছে অবশ্যই। থেকে থেকে শরীরের রঙ পালটাচ্ছে। হঠাৎ বিশুবাবুর শরীর থেকে ছায়ার মতো কালো আর একটা বিশু বেরিয়ে এসে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ফকির বললেন, 'হয়ে গেছে। কালপুরুষ বেরিয়ে গেছে। যাও স্নান করে এসো।'

বিশুবাবু বীরের মতো এগিয়ে গেলেন পুকুরের দিকে। অন্ধকার রাত। দিনের বেলাতেই আমি সাপ ঘুরতে দেখেছি. গোখরো কেউটে। অন্ধকারে জল দেখা যাবে না। তবে বিশুবাবুর আর ভয় কি! লকাবাবু বললেন, 'আমার কিছুই হল না। তুমি দেখলে, মানুষটা এতক্ষণ নাঙ্গা দাঁড়িয়ে রইল একটুও খারাপ লাগল না। মনে হল পেতলের মহাদেব।'

সন্ন্যাসী শুনতে পেয়েছিলেন। লকাবাবুর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'এক একজনের এক এক ভাব। এক এক কর্মফল। সবই সেই অনুসারে হয়। দেখোনি, কেউ সারা দিন রাত পড়ে সেকেন্ড ক্লাস পায়, কেউ দিনে তিনঘণ্টা পড়ে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট। বিশ্বাস রাখো। হঠাৎ পাওয়ার চেয়ে সাধনা করেই পাওয়া ভালো। তোমার পথ ভক্তির, তোমার পথ সৎকর্মের। ওর পথ যোগের। তুমি দেখবে ফকির ওকে তন্ত্রের পথে নিয়ে যাবে। ফকিরের অসীম শক্তি। ফকির দিনকে রাত রাতকে দিন করতে পারে। ফকির নিজে একজন মহাযোগী। কিন্তু ভক্ত নয়। ফকির হল শক্তি আমরা হলুম প্রেম। ধৈর্য ধরে দেখ না কি হয়। ফকির তাক লাগাচ্ছে। আমরা লাগাবো প্রেম। ফকির বাজাবে শিঙা, আমরা বাজাবো বাঁশি। সেই বাঁশি শুনে ছুটে আসবেন কৃষ্ণ। ফকিরের কেরামতিতে ভয় দেখাতে আসবেন ছিন্নমস্তা। অনেক পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায় লকা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, বাড়িতে দুভাবে ঢোকা যায়, সদর দরজা দিয়ে আবার পাইখানার দরজা দিয়ে। কোন পথে যাওয়া ভালো তুমিই বিচার করো। বিশুর এইটাই পথ। ফকির অমনি কপ্ করে ধরে নিয়েছে। বিশু ডাকাবুকো লোক, ভালই হয়েছে। তবে এইপথে সেই ক্ষোদ-মালিককে পাওয়া শক্ত। বড় জোর তাঁর কিছু শক্তি পাওয়া যেতে পারে। তখন ঈশ্বর হয়ে ওঠেন নিজের শক্তির অহংকার।'

'তাহলে তো এইসব ভালো নয়।'

'ভালো-মন্দের বিচার আমি করার কে? তবে ঘোর অবিশ্বাসী মানুষকে শায়েস্তা করার জন্যে এর প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানীর ভীষণ অহংকার। সেই অহংকারের জবাব প্রজ্ঞান। শোনো. একালের মানুষ হাসে যখন তাদের বলা হয় দ্যাখো লংকায় যাবার জন্যে রামচন্দ্রকে সেতু তৈরি করতে হল, অথচ হনুমান, জয় রাম, বলে এক লাফে সাগর

টপকে গেল। মানুষ বিশ্বাস করবে না, ও তো গল্প, বলে পাশ ফিরে শোবে। পুষ্পক রথে রাবণ সীতা হরণ করেছিলেন। শুনে সবাই হাসলেন। আরব্যরজনীর উড়ন্ত কার্পেট, সবাই হাসলেন। বিমান দেখে গবেষকরা ভাবতে বসলেন, তাহলে কি সেই সময় বিমান ছিল! যোগীর যোগক্ষমতা যন্ত্র নয়, ক্ষমতা। কেনা যায় না, অর্জন করতে হয়। সাধনা করতে হয়। সাধনায় মানুষ গান শেখে, নাচ শেখে, সেও তো সাধনা, এও সাধনা। এই সাধনা করাবার গুরু পাড়ায় পাড়ায় নেই, শেখার উৎসাহও নেই কারোর, কেন জানো, হেঁটে নদী পার হবার জন্যে কঠিন সাধনা করে লাভ কি! এক আনা পয়সা ফেললেই তো মাঝি পার করে দেবে। তার মানে এই নয় যে মানুষ সেই শক্তি অর্জন করতে পারে না। মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ত্রৈলঙ্গস্বামী কাশীর গঙ্গায় পদ্মাসনে ভেসে ভেসে বেড়াতেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। নৌকায় যেতে যেতে বিদেশী সরকারের অফিসার খুব শাসালেন, একি অসভ্যতা! তরোয়াল উঁচিয়ে ভয় দেখালেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী তরোয়ালটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জলে ফেলে দিলেন। সাহেব তো রাগে অস্থির। তখন ত্রৈলঙ্গস্বামী জল থেকে একটা করে তরোয়াল তুলতে লাগলেন, কোনওটা সোনার, কোনওটা রুপোর, কোনওটার হাতলে হীরে বসানো। সাহেবের চক্ষুস্থির। এইসব কি করে হয়! একেই বলে যোগ-সিদ্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ পওহারী বাবাকে দেখেছিলেন। তাঁর আহার ছিল পবন। বাতাস আহার করতেন। অন্য কোনও খাদ্যের প্রয়োজন হত না। কি সেই শক্তি! প্রাণায়াম। প্রাণায়াম প্রাণকে স্থির করে। দেহ মানে ইন্দ্রিয়। প্রাণ স্থির হলে, ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হলে বাইরের জগতের অনুভূতি আর থাকে না। চোখ যদি না দেখে, কান যদি না শোনে, শরীরে স্পর্শবোধ যদি না থাকে, নাক যদি গন্ধ না নেয়, তাহলে তোমার এই জগৎ আর রইল কোথায়! সমস্ত ইন্দ্রিয় সংকুচিত হয়ে বিন্দু-স্থানে বিলীন হয়। রূপ রসের বিচিত্র জগৎ তখন শূন্যাকার, নিজের দেহবোধও থাকে না। অহংবোধ সূক্ষ্ম তেজোময় সত্তাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। প্রথমে সামান্য চঞ্চল, পরে দীর্ঘ অভ্যাসে স্থির এক জ্যোতি। আরও অভ্যাসে, তুমি আর তোমার জ্যোতি এক হয়ে শুধুই জ্যোতি। তখনও তোমার স্পন্দনবোধ আছে। জীবনের বোধ। যাকে

বলে, আদি সংকল্প। অবশেষে সেই বোধও আর থাকে না। তখন তোমার উন্মনী অবস্থা। তখন তোমার সামনে আবির্ভূত হবে মহাবিন্দু। তখন তুমি দেখবে অন্য আর এক জগৎ। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বদলে, সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় জগৎ। লকা, এ হল মহাযোগের কথা। প্রদীপের শিখা তুমি দেখেছ। শিখার চারপাশে জ্যোতির্ময় প্রভা। ঠিক সেই অবস্থা হয় সাধকের। নিজে সেই শিখার কেন্দ্রবিন্দু। সেই বিন্দুকে ঘিরে একের পর এক জ্যোতির্বলয়। চৈতন্য, চৈতন্য, চৈতন্য। একেই বলে ক্রিয়াযোগ। ধীরে ধীরে, ইন্দ্রিয় সংযম করতে করতে আত্ম-দর্শন, আত্মস্থিতি, শেষে পরমাত্মায়লীন। তোমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে লকা, তবু যতটুকু হয়। ঝুঁকি মেরে যতটা এগোতে পারো।'

ফকির বিশুবাবুকে একটা লাল কাপড় পরিয়েছেন। তিনি বললেন, 'কি মহারাজ, পেরেছি কি না?'

ফকির বললেন, 'পেরেছো। এখনও বাকি আছে একটা। ঘৃণার পরীক্ষা।'

'সেটাও আজ হয়ে যাক।'

'না, তার জন্যে আর একদিন।'

'বেশ, সেটাও আমি পারবো। কেন পারবো জানেন? আপনিই আমাকে পারিয়ে দেবেন। আমি যে আপনার।'

ফকির হো হো করে হেসে বললেন, 'বেটা মহাশয়তান।'

রাত ভোর হয়ে গেল। পরের দিন ফকির মহারাজ পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি করলেন বেলতলায়। বিশুবাবুকে দিয়েই সব করালেন। সাধুমহারাজ বললেন, 'তোমার তো সামান্য ভুল হল ফকির।'

'কি ভুল মহারাজ?'

'পঞ্চমুণ্ডীতে কি কি থাকে জানো, মানুষ, শৃগাল, বৃষ, কুকুর ও সর্প।'

'জানি মহারাজ। সেটা এক মত, এ যা হল এও আর এক মত, তবে একটু কম জোর।'

'আমার গুরুর ছিল নবমুণ্ডীর আসন। নবমুণ্ডীতে কি কি থাকে জানো—মানুষ, বনমানুষ, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, সজারু, বিড়াল আর সর্প। নবমুণ্ডীর আসন বড় একটা দেখা যায় না। আমার গুরু বলতেন আসন আর আসীন। আত্মিকতেজের বিকাশের

পক্ষে শবাসন সর্বাধিক উপযোগী।'

'শবাসন একালে সম্ভব নয়।'

'প্রকৃত শবাসন কাকে বলে জানো? তুমি নিজেই শব। নিজের দেহ হল শব। সেই শবের ওপর তোমার চৈতন্যকে বসাও। শবরূপী দেহ হল আসন, তোমার চৈতন্য হল আসীন। এইবার দেহ ছেড়ে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে আরোহণ। যে-যোগী নিজের দেহকে ব্রহ্মাণ্ড-রূপে ধারণা করতে পারেন—তারই নাম বৈরাজ ধারণা। এই ব্রহ্মাণ্ডের চৈতন্য অংশটুকুকে যে-যোগী আলাদা করে নিতে পেরেছেন, তার কাছে এই ব্রহ্মাণ্ড হল শব। এই ব্রহ্মাণ্ডের ওপর যে-যোগী অধিষ্ঠান করেন তিনি ব্রহ্মারও অতীত। তিনি ব্রহ্মাণ্ডরূপী নিজের দেহকে শবে পরিণত করে তার ওপর নিজের চৈতন্যকে বসিয়ে ধ্যানস্থ হন। ব্রহ্মা তখন প্রেত, ব্রহ্মার কায় তখন আসন। এই আসনের নামই একমুণ্ডী আসন। এরপর দ্বিমুণ্ডী-আসন-সাধক যোগী আছেন। তিনি এই প্রাকৃত জগতের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আয়ত্ত করেছেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা। তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন। ফকির ঠিক তোমার মতো। পঞ্চমুণ্ডী আসন হল সদাশিব আসন। ঈশ্বর আত্মদৃষ্টির নিমেষরূপ, আর সদাশিব আত্মদৃষ্টির উন্মেষরূপ। বাঁ হাতে ধাক্কা মেরে তিনি জীবকে অন্ধকারময়,কর্মপ্রধান, দুঃখবহুল মায়ারাজ্যে ছুঁড়ে ফেলেন। তিনিই আবার ডান হাতে চৈতন্য শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে দুঃখ ও অজ্ঞানের জগৎ থেকে জীবকে মুক্ত করে জ্যোতির্ময় ও আনন্দময় চিদ্‌রাজ্যে আকর্ষণ করেন। সেটাও শক্তির রাজ্য। সেখানেও চঞ্চলতা আছে। স্বাধীনতা নেই। সেইকারণেই ঈশ্বর ও সদাশিব উভয়কেই নিষ্ক্রিয় শবরূপী আসনে পরিণত করতে হবে। এইটিই পঞ্চমুণ্ডী পরিকল্পনা। পাঁচটি মুণ্ড হল প্রতীক শক্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব। শবরূপী শিবের ওপর মায়ের যেরূপ—কালীরূপ। শিবাসনে কে আসীন? মা কালী। এই আসনের মহিমায় সাধক তাঁর শ্রীচরণে স্থানলাভ করেন। এক হয়ে যান। পঞ্চমুণ্ডীর সাধনা কালচক্রের অন্তর্গত কৃষ্ণপক্ষের সাধনা। কৃষ্ণ প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত এর বিকাশ। অমাবস্যা কালীর প্রতীক।'

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল আশ্রমের সামনে। নেমে এলেন সেই অধ্যাপক।

।। আট ।।

অধ্যাপক হাসতে হাসতে নেমে এলেন তাঁর গাড়ি থেকে। কালো রঙের গাঁট্টা গোঁট্টা একটা মটোর গাড়ি। চালকের ইয়া বড় এক গোঁফ। অধ্যাপকের বগলে একটা বিছানার পুঁটলি। গাড়ির পেছন দিকটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল এক বস্তা বই। আমি তাঁর হাত থেকে বিছানার বাণ্ডিলটা ধরে নিলাম। বলতেও হল না, বিশুদা এসে বইয়ের বস্তাটা কাঁধে তুলে নিলেন ! আমরা সবাই মিছিল করে আশ্রমে ঢুকে পড়লুম। সাধু মহারাজ বললেন, 'তাহলে চলেই এলেন ?'

'না এসে উপায় আছে মহারাজ। হৃদি বৃন্দাবনে / তোমারি কারণে / সর্বনাশা বাঁশি বেজেছে আজ ॥ কি আকর্ষণ ! যেন অজগরে টানছে ! এই সামান্য চব্বিশটা ঘণ্টা, তাও আমি ছটফট করেছি। মনে হয়েছে কখন যাবো। কখন গিয়ে পেঁছিবো আমার বারাণসীতে।'

'এইবার আমাদের থাকার অসুবিধের কথা বলি। ঘর নেই। আলাদা স্নানঘর নেই। কলও নেই। আছে একটা পুকুর। আছে এই রক। আর এই ঠাকুর-ঘর।'

'এ আমার কাছে কোনও সমস্যাই নয় মহারাজ। জীবন হল একটা অভ্যাস। মনের জোরে মানুষ নিজেকে অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে। মনই সব মহারাজ। আর মনের জোর আসে কোথা থেকে জানেন মহারাজ ? ভালবাসা থেকে। আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি। এই দেখুন, কাকে আমি জ্ঞান দিচ্ছি। মাস্টারমশাইদের এই এক মহা রোগ।'

'আপনি আমাকে জ্ঞান দেননি। নিজের বিশ্বাসটাকেই ভাগ করে নিতে চাইছেন আমার সঙ্গে। জানেন তো, বয়স একটা বিষয়। যৌবনে যা পারা যায়, বার্ধক্যে তা পারা যায় না ; কিন্তু আপনি পারবেন। কেন জানেন, আপনার চোখে এখনও আগুন আছে। জীবনের আগুন প্রাণশক্তি।'

লকাবাবু রকে একটা চ্যাটাই পেতে দিলেন। অধ্যাপকের হাত ধরে বললেন, 'বসুন মহারাজ।'

'আমি আর অতিথি নই, আমি আপনাদেরই একজন। অতএব

কোনও খাতির নয়। মিলেমিশে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।'

'আপনাকে খাতির করবো না তো কাকে করবো! আপনি যে শিক্ষক। শ্রদ্ধা করছি আপনার জ্ঞানকে, আপনার জীবনকে। আমরা যে সবাই আপনার ছাত্র হব।'

অধ্যাপকের গাড়ি চলে গেল। বিশুদা বললেন, সবার আগে তো একটা ব্ল্যাকবোর্ড চাই। ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া তো বিদ্যালয় হয় না। আমার সন্ধানে একটা বোর্ড আছে, নিয়ে আসবো!'

ফকির বললেন, 'এখন না। এখন আমরা ভোগ রাঁধতে যাবো। আমাদের কাজ এইবার সব ভাগ করে নিতে হবে। এক এক দলের এক এক দায়িত্ব।'

বিশুদা বললেন, 'ঝাড়-পোঁছ, ধোয়া-ধুয়ি, তোলা-তুলি এই সব কাজ আমার।'

'তুমি যা চাইবে, ঠিক তার উলটোটা তোমাকে দেওয়া হবে।'

'ভয় পাই না মহারাজ। যা বলবেন। অপরাধ হয়ে গেছে।'

সাধু মহারাজ ছবিকে আর আমাকে অধ্যাপকের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'এরাই আপনার প্রথম ছাত্র আর ছাত্রী। তোমরা প্রণাম করো।'

অধ্যাপককে একেবারে সায়েবের মতো দেখতে। ফিটফাট, সাংঘাতিক। পেছন দিকে ওল্টানো চুল। চোখে সরু সোনার ফ্রেমের চশমা। মুখে রোদের মতো হাসি। আমি যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে দার্জিলিঙ-এর কমলালেবু। কমলালেবুর সঙ্গে আমার জীবনের অনেক সুখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রোদ-ঝলমলে দুপুরে চিড়িয়াখানায় ঘাসে ঢাকা মাঠে আমি, বাবা, মা. আমার সেই বোনটা, সবাই মিলে বসে আছি, আর একটা, একটা করে কমলালেবু ছেঁড়া হচ্ছে। সুন্দর গন্ধ। কোয়ার পাতলা খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের ফুল ফুল দানা মুখে ফেলা হচ্ছে। সামনের ঝিলে যত বিদেশি পাখির জটলা। ট্রেনে চড়ে সাঁওতাল পরগনায় চেঞ্জে যাচ্ছি আমরা, সেখানেও কমলালেবু। কমলালেবুর রঙের বাড়ির গায়ে দুপুরের রোদের হাসি। সেও এক সুখ। অধ্যাপক যেন সেইরকম এক সুখ।

অধ্যাপক বললেন—'বাঃ, এ যে দেখি এক জোড়া দেব আর দেবী। বুদ্ধিদীপ্ত, সুন্দর আর সুন্দরী। তা এখনই শুরু করে দেওয়া যাক।'

সাধু মহারাজ বললেন, 'এখনই নয়। আপনি আগে ঘুরেফিরে

জায়গাটাকে আপন করে নিন. তারপর।'

ছবি বললে, 'চলুন, আপনাকে সব দেখিয়ে আনি।'

'আমিও কি যাবো ছবি তোমাদের সঙ্গে ?'

ছবি ঘাড় নাড়ল। ছবিকে আমার ভীষণ ভয় করে আজকাল। বড়দের মতো গম্ভীর হয়ে থাকে। তাছাড়া ছবির অন্য অনেক ক্ষমতা হয়েছে। ছবি রেগে গেলে মানুষের ক্ষতি হয়। ছবি হেসে তাকালে মানুষের ভাল হয়। ছবি বইয়ের মলাট না খুলে ভেতরের সব লেখা হুড়হুড় করে বলে যেতে পারে। ছবি একবারে গোটা একটা পাতা পড়তে পারে। ছবির কুঁচকালো চুলে মৌমাছি জড়িয়ে থাকে। ছবি হাতের মুঠোয় প্রদীপের শিখা চেপে ধরে। ছবির হাত পোড়ে না। ছবি জেগে জেগেই কতরকম কি দৃশ্য দেখে। ছবি কখনও আপন মনে ঠাকুরঘরে বসে বসে হাউ হাউ করে কাঁদে। কখনও হাসে। কখনও কথা বলে। গড়গড় করে সংস্কৃত শ্লোক বলে। এমন সুরে গান গেয়ে ওঠে যেন কত বড় ওস্তাদ। আবার যখন নাচে মনে হয় স্বর্গের অপ্সরা। সেই ছবি আর নেই, যে ছবি আমার সঙ্গে খেলতো ছুটতো। পাঁচু-ঠাকুরের আটচালায় গিয়ে নাচত, গাইত। সাধু মহারাজ বলেছেন—ছবি পূর্বজন্মে খুব বড় এক সাধিকা ছিল। সাধনার যেটুকু বাকি আছে, সেইটুকু শেষ করার জন্যে আর একবার জন্মাতে হয়েছে। এই আশ্রম ছবির জন্যেই হয়েছে। বহু সাধক এখানে আসবেন ছবিকে সাধন-ভজন করাতে।

আজ ছবি খুব স্বাভাবিক। সেই আগের মতোই। গেরুয়া রঙের শাড়ি পড়েছে। এলো চুল। পীচফলের মতো গায়ের রঙ। আলতা পরে না ; কিন্তু পা দুটো লাল টুকটুকে। পাতলা, পাতলা। পায়ের আঙুলগুলো যেন মোচার কলির মতো। যে দেখে. সেই বলে এমন রূপ মানুষের হয় ! মায়ের কাছে বড় বড় ঘরের মায়েদের লাইন লেগে গেছে। ছবিকে ছেলের বউ করবে। আমার ভীষণ ভাল লাগে। ছবির গর্বে আমার গর্ব। ছবি সাত ঘোড়ার গাড়ি চড়ে রাজকন্যার মতো যাবে। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। ছবি তো রাজরানী হতেই পারে। রাজারা তার ওই সুন্দর পায়ের তলায় পড়ে থাকবে। রোজ আমি ভাবি। ভাবতে ভাবতে দেখতে পাই। রাজা হয়েছে ছবির পাদানি। খুলে পড়ে গেছে মাথার মুকুট। ছবির হাতে হীরে বসানো

রাজদণ্ড। ছবি সম্রাজ্ঞী। অনেকেই বলাবলি করত, ছবির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। গোকুলবাবা কায়দা করে ঘর-জামাই ধরেছেন। শুনে আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে যেত। আমার মনে হত, ভাই হওয়া কত ভাল। বর হওয়া খুব বিশ্রী। ভাইবোনের সম্পর্কের মতো সম্পর্ক আছে পৃথিবীতে! সব সেরা। ছবি আমার চিরকালের বোন। সবচেয়ে ভাল হত, ও যদি আমার দিদি হত। কি হবে, ও আমার চেয়ে এক বছরের ছোট।

ছবি অধ্যাপককে বলছে, 'এই আমাদের সরোবর।'

'শুধু সরোবর বলছ কেন মা? বিশেষণ লাগাও। বলো, হংসসরোবর। দেখছ না, হাঁস লেগে আছে।' বাঃ বেশ মজার মানুষ তো। মোটেই গম্ভীর নন। অধ্যাপক একটা কদমগাছ দেখিয়ে বললেন, 'ওই আমাদের কদমতলা। আর ওই হল আমাদের বংশীবট। আর ওই যে পাঁচটা গাছের জটলা ওই আমাদের পঞ্চাননতলা। আহা, কদমের কি শোভা! ওই গাছের তলায় কৃষ্ণ যদি এসে না দাঁড়ান তাহলে ওই বৃক্ষের বৃক্ষজীবনই ব্যর্থ।'

অধ্যাপক আমার দিকে তাকালেন তাঁর আকাশের মতো চোখে। বললেন, 'বিলু, তুমি ওই গাছের তলায় কেষ্টঠাকুরটি হয়ে একবার দাঁড়াও তো বাবা।'

'আজ্ঞে, আমার নাম যে বিলু নয়।'

'তাতে কি হয়েছে—হোয়াট ইজ ইন এ নেম? এ রোজ ইজ এ রোজ এণ্ড এ। নামে কি যায় আসে। গোলাপ সে গোলাপ এবং গোলাপ। বিলু নামটাই তোমাকে মানাচ্ছে। আর এই মেয়েটি হল আমার রাধা। বিলু তুমি একবার ওইখানে গিয়ে দাঁড়াও, আর এই নাও গাছের এই ভাঙা ডালটা তোমার বাঁশি।'

'আমার যে লজ্জা করছে!'

'লজ্জার কি আছে বাবা। তুমি যদি নিজেতে কৃষ্ণ আরোপ করো, সে তো ভালোই। কৃষ্ণের স্বভাব পাবে। একে বলে আরোপ-সাধনা। মহাপ্রভু নিজেকে মনে করতেন রাধা। সমুদ্রের অতল কৃষ্ণ জল দেখে মারলেন ঝাঁপ, আর উঠলেন না। একেই বলে মহাভাব।'

ছবি বললে, 'যাও না গিয়ে দাঁড়াও না। একদিন তো তুমি দাঁড়িয়েছিলে।'

আমি সেই কদমতলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। মাথার ওপর কদমগাছ। সবুজপাতায় বাতাসের হিস হিস শব্দ। অধ্যাপক ভাবে বিভোর হয়ে কেঁদে ফেললেন। চোখ মুছে বললেন, 'এই কদমতলায় আমি কৃষ্ণ-মন্দির চাই। চাঁদের আলোয় আমি বাঁশি শুনেই ছাড়বো।'

অধ্যাপক বুঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বহুক্ষণ।

ফকির বললেন, 'অপূর্ব সব নাম হয়েছে—কদমতলা, পঞ্চাননতলা, বংশীবট, হংসসরোবর। ওই পঞ্চাননতলাতেই আমার পঞ্চমুণ্ডী হবে। গভীর রাতে সাধক বসবে মহাসাধনায়। গাছের ডালে ডালে প্রেত-পিশাচের হাসি। কত ঝড়, কত বজ্র-বিদ্যুৎ।'

সেদিন দুপুরে আহারে বসে আমাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। অধ্যাপকের সম্মানে ভালই সব তৈরি হয়েছিল। বিশুদা আর লকাবাবু দুজনে মিলে সব করেছিলেন। বিশেষ ব্যবস্থা। সবাই ঝুঁকে পড়েছেন মুখে তোলার জন্যে। সাধু মহারাজ হঠাৎ বললেন—'না, না।'

সবাই সোজা হলেন। সকলেই কেমন যেন হয়ে গেছেন। মহারাজ বললেন, 'আজ আহার নয় প্রত্যাহার। কোনও কিছু স্পর্শ না করে তাকিয়ে থাকো সকলে।'

॥ নয় ॥

আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। সামনে ভাল ভাল খাবার; কিন্তু খাওয়া চলবে না। সন্ন্যাসী মহারাজের সাংঘাতিক হুকুম। সামনে খাবার রেখে সবাই হাসি হাসি মুখ করে বসে আছেন। হাতগুটিয়ে। নাকে এসে লাগছে সুন্দর গন্ধ। ফকির মহারাজ ডালটা খুব যত্ন করে রেঁধেছিলেন। সোনার মতো রঙ হয়েছে। তেমনি তার সুগন্ধ। সাদা ধবধবে ভাত ফুসফুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে। সব আনাজ-পত্র দিয়ে একটা তরকারি হয়েছে। পোস্ত হয়েছে। সবাই সুখাদ্য।

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'মন ছটফট করবে। পেট জ্বলে যাবে। হাত এগোতে চাইবে। তবু না। খাওয়া চলবে না কিছুতেই। মন দিয়ে মনকে ধরে রাখো। ভোগ নেই আমি ভোগ করি না, সে এক কথা। তার নাম দারিদ্র্য। ভোগ আছে, তবু আমি ভোগ করি না, এর নাম, ত্যাগ, এর নাম সংযম। এর নাম প্রত্যাহার। এটাও এক সাধনা। এও এক যোগ।

'মনকে প্রলোভনের মধ্যে ফেলে, মনকে মনের বাঁধনে বাঁধা। এখন প্রশ্ন হল, কতক্ষণ আমরা বসে থাকবো! যতক্ষণ না মন শান্ত হচ্ছে! মন উপেক্ষা করছে। এইবার আরো এক পরীক্ষা, কার মন কত তাড়াতাড়ি শান্ত হচ্ছে! সেটা তোমরা আমাকে সত্য সত্য বলবে। বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করবে না।'

প্রথম লকাবাবু। মিনিট পনের বসে থাকার পর বললেন, 'আমার মন থেকে খাওয়ার বাসনা চলে গেছে মহারাজ।' আমার মনে হল, লকাবাবু প্রথম হলেন। দ্বিতীয় হলেন, অধ্যাপক। তিনি বললেন, 'মনে আর আহার নেই।' তৃতীয় হলেন, বিশুদা। তিনি বললেন, 'মন জব্দ হয়েছে প্রভু।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'ফকির তোমার কি অবস্থা?'

ফকির হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি আকণ্ঠ ভোজন করে বসে আছি।'

'কি ভাবে?'

'কায়া আহার। মানস ভোজন। সবই তো সেই এক থেকে।

যাঁর মন, তাঁরই আহার। যে ভোগ করবে, যাকে ভোগ করবে, দুটোই করে ফেলেছি। কোনও বিভেদ রাখিনি। আমিই ডাল, আমিই তরকারি, আমিই অন্ন। নাও, এইবার কি করবে করো।'

'ও তুমি তো মহা চালাক হে! তুমি চলে গেলে কঠোপনিষদের পথে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। এই জগতের সব কিছুই পরব্রহ্ম থেকে নির্গত।'

'এর আগে যা আছে মহারাজ, সেটিও অনুশীলন করতে হবে, যা আমরা করছি এখন, আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগহমেব চ। শরীর হল রথ, আত্মা হল রথী, বুদ্ধি হল সারথি আর মন হল লাগাম।'

'হ্যাঁ, ধরেছ ঠিক। তত্ত্বকে অভ্যাস করতে হবে ফকির। গ্রন্থ থেকে মুক্ত করে জীবনে আনতে হবে। তোমরা কে কে আমাকে গালাগাল দিচ্ছ?'

বিশুদা বললেন, গালাগাল? আপনাকে কে গাল দেবে মহারাজ! আমাদের ভীষণ ভাল লাগছে। একদিন না খেলে মানুষ মরে না। আজ আমরা আমাদের মনের খবর পেলুম। মন যে আছে তা তো আমরা সহজে বুঝি না। অকাজে-কুকাজে সারাদিন ব্যস্ত। আজ আমরা মনের ছটফটানি টের পেলুম। টের পেলুম মনের শান্ত হওয়া। মন যে সত্যই লাগাম তা বোঝা গেল আজ।'

'বাচ্চা দুটোর কি হবে!'

আমি বললুম, 'মহারাজ, আমারও বেশ ভাল লাগছে। প্রথমে দুঃখ হয়েছিল। রাগ হয়নি কিন্তু।'

ছবি বললে, 'আমার বেশ মজা হল। খাবারের দিকে তাকানো মাত্রই আমার পেট ভরে গেল। এমন ভরে গেছে যে রাতেও আর খেতে হবে না।'

মহারাজ বললেন, 'এই মেয়েটা দেখি সবই আয়ত্ত করে বসে আছে। পূর্বজন্মের সাধনার ফল নিয়ে জন্মেছে।'

লকাবাবু বললেন, 'এইবার আমরা কি করবো মহারাজ?'

'এইবার তোমরা করবে না, আমি করবো। তোমাদের পুষ্পান্ন খাওয়াবো।'

বিশুদা বললেন, 'সেটা কি জিনিস মহারাজ?'

'ধরো পোলাও।'

'পোলাও তো এখানে নেই মহারাজ।'

'আছে। আমাদের মনে আছে। শোনো সে বড় মজা, অগ্নি প্রবেশ করল মুখে, তৈরি হল বাগেন্দ্রিয়। বায়ু প্রবেশ করল নাকে, তৈরি হল গন্ধ নেবার অনুভূতি। সূর্য প্রবেশ করল চোখে, আমরা পেলুম দৃষ্টি। দিগ্‌নির্দেশ প্রবেশ করল কানে, তৈরি হল শ্রবণেন্দ্রিয়। বৃক্ষ আর গুল্ম প্রবেশ করল ত্বকে, তৈরি হল রোম, আমরা পেলুম স্পর্শেন্দ্রিয়। চন্দ্র মন হয়ে প্রবেশ করল হৃদয়ে। মৃত্যুর অধিষ্ঠান হল নাভিতে অপান হয়ে। জল প্রবিষ্ট হল লিঙ্গে। ধারণ করল বীর্যের আকার। এই হল জীব দেহ। তারপর, ক্ষুধা আর তৃষ্ণা এসে বললে, প্রভু আমাদের কথা চিন্তা করুন। কোন্ আশ্রয়ে থাকবো আমরা! প্রভু বললেন, তাই তো! তোমরা তো হলে অনুভূতি। অনুভূতি তো কিছু গ্রহণ করতে পারে না। শরীর ছাড়া। একটা কায় চাই। বোধ সম্পন্ন জীবদেহের প্রয়োজন। বেশ তাহলে তোমরা এই দেবশরীরকেই আশ্রয় করো। আমাদের যা নিবেদন করা হবে দেব ভোগ হিসাবে তোমরা তার অংশ পাবে। তোমরা তা গ্রহণ করবে। তাই তো আমরা বলি, জিভ দিলেন যিনি, আহার দিলেন তিনি। রামপ্রসাদ বললেন, আহার নয় আহুতি। আহার করো মনে করো আহুতি দি শ্যামা মাকে। এই ভোগ আমি তাঁকে নিবেদন করি পুষ্পান্ন ভেবে। তিনি কে? তিনি তো আমিই। আমি কে, পঞ্চ তত্ত্ব। এইবার দেখ, সত্যই হয় কি না? তিনি গ্রহণ করলে, আমাদেরও গ্রহণ করা হয় কিনা! তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর পাত্র থেকে কণামাত্র গ্রহণ করে বললেন, ভুরি-ভোজ হল। উদ্গার তুললেন, মুনিদের অমনি পেট ভরে গেল, তাঁরা আর নদী থেকে স্নান সেরে ফিরলেন না। পালিয়ে গেলেন।'

সন্ন্যাসী মহারাজ ধ্যানস্থ হলেন। আমরা নীরবে বসে আছি। হঠাৎ আমাদের নাকে অদ্ভুত এক গন্ধ এল। জিভে এসে লাগল অদ্ভুত এক স্বাদ। চিনতে পারলুম, পোলাও যেমন হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পেট আইঢাই করতে লাগল।

সাধু মহারাজ চোখ মেলে বললেন, 'তৃপ্ত?'

অধ্যাপক বললেন, 'প্রভূত। আর প্রয়োজন নেই মহারাজ। প্রচুর

আহার হল। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল আজ। শাস্ত্র যে সত্য তা আজ বুঝে গেছি। প্রয়োজন, শাস্ত্র-সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ।'

সাধু মহারাজ বললেন, 'যাও এইবার এই প্রসাদ বিতরণ করে দাও। নিয়ে যাও আশ্রমের বাইরে। আজ থেকে এই ঠিক হল, প্রতিদিন কমপক্ষে দশজন অতিথি নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা আমরা করব।'

বেলা তিনটের সময় অধ্যাপক বসলেন রকে। বললেন, 'আজ থেকে শুরু হল আমার স্কুল।'

মনে মনে সেদিন হেসেছিলুম, ছাত্র ছাড়াই স্কুল! এক পাশে আমি আর এক পাশে ছবি। কেউ কোথাও নেই। এর নাম স্কুল! অধ্যাপক সোজা হয়ে বসে আছেন। সামনে একটা জলচৌকি।

অধ্যাপক শুরু করলেন, আমি তোমাদের প্রথম ক্লাস শুরু করছি একটা গল্প দিয়ে। বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে গেলো জাপানে। জাপানে গিয়ে নাম হল, জেন বুদ্ধ। এই ধর্মের বড় বড় মহাজ্ঞানী সাধক তৈরি হল সেখানে। অদ্ভুত তাঁদের সাধনা, জ্ঞান, আর জীবন। সেখানে এক সেনাধ্যক্ষ একদিন খবর পেলেন, কাছাকাছি এক মহাসাধক এসেছেন, তিনি সবাইকে এমন শিক্ষা দিচ্ছেন, যাতে মানুষ জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে পরম শান্তি পাচ্ছে। তা সেনাধ্যক্ষের কৌতূহল হল, দেখাই যাক না, কি এমন জ্ঞান তিনি দিচ্ছেন। সেই কর্নেল একদিন খুব সেজেগুজে সেই সাধকের কাছে গেলেন। চকচকে বোতাম। মাথায় টুপি। কোমরে কারুকাজ করা খাপে তরোয়াল। তিনি গটমট করে সেই সাধুর আশ্রমে গিয়ে ঢুকলেন। কর্নেল তিনি। কারো পরোয়া করেন না। প্রয়োজনে হাসতে হাসতে এক কোপে মানুষের মাথা কেটে ফেলতে পারেন তিনি। কোমর থেকে খাপ সমেত তরোয়াল খুলে ঠকাস করে সাধুর সামনের কাঠের ডেস্কে রেখে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'শুনলুম মানুষকে আপনি খুব জ্ঞানট্যান দিচ্ছেন। সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়িয়ে যাচ্ছে, তা শুনি কি সেই জ্ঞান!' কর্নেল পা নাচাতে লাগলেন।

সাধু স্বপ্নের মতো চোখ তুলে মধুর গলায় বললেন, 'আপনি এলেন, পথশ্রান্ত। বসুন। আগে একটু চা-পান করুন। তারপর জ্ঞানের কথা হবে।'

জেন সন্ন্যাসী উঠে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন তিনি। এক হাতে কানায় কানায় ভর্তি এক কাপ চা, আর এক হাতে চা ভর্তি কেটলি। ভর্তি কাপটা কর্নেল-এর সামনে রেখে সসম্ভ্রমে বললেন, 'অনুগ্রহ করে একটু চা-পান করুন।' বলেই তিনি সেই ভর্তি কাপে কেটলির চা ঢালতে শুরু করলেন। কাপ উপচে চা প্লেটে পড়ল, প্লেট থেকে ডেস্কে। ডেস্ক থেকে ঘরের মেঝেতে।

কর্নেল ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি পাগল না কি ? ভর্তি কাপে চা ঢালছেন ?'

জেন সন্ন্যাসী তখন উল্টো দিকের আসনে বসলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'এইটাই আমার প্রথম জ্ঞান। দেখলেন তো, পূর্ণ পাত্রে কিছু ঢাললে তা উপচে পড়ে যায়। কিছু নিতে হলে শূন্যপাত্রে আসতে হয়। আপনি তো অহংকারে পরিপূর্ণ। পূর্ণ যদি হতে চান শূন্য হয়ে আসুন।'

কর্নেল মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

॥ দশ ॥

অধ্যাপক প্রথম গল্পটি শেষ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললেন, আর একটা গল্প শোনো। সেকালে ছাত্ররা গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করতেন। ব্রহ্মচর্য কাকে বলে? তোমাদের জানা উচিত। তোমাদের এই বয়সই হল সেই বয়স। মানুষের মাথাটাই হল সেরা অংশ। মাথাতেই শক্তি। মাথাতেই থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি। পৃথিবীতে যত বড় বড় মাথাঅলা পুরুষ এসেছেন, যাঁদের নাম ইতিহাস কোনওদিন ভুলবে না, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মচর্যবান। ব্রহ্মচারী হলে অসাধারণ শক্তিলাভ করা যায়। যে কোনও মানুষকে বশে আনা যায়। সমস্ত মানুষ তাঁর সামনে এসে থমকে যায়। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। এমনই তাঁর জ্যোতি, এমনই তাঁর শক্তি। এই শক্তির উৎস হল ওজঃ। এই ওজঃ এসে জমে মানুষের মাথায়। মস্তিষ্কে। যাঁর মাথায় যত ওজোধাতু এসে জমবে, তিনি সেই অনুপাতে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবেন। সমস্ত মানুষের ভেতরেই অল্প-বিস্তর ওজঃ আছে। আমাদের ভেতরে যতরকমের শক্তি খেলা করছে এই ওজঃ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বীর্যধারণ করতে পারলেই ওজঃ হয়। এর জন্যে চাই দেহ আর মনের পবিত্রতা। পবিত্র খাদ্য খাবে। পবিত্র দেহে থাকবে। সৎসঙ্গ আর সৎচিন্তা করবে। তাহলেই তোমরা হবে কামজয়ী। আর কামজয়ী হলেই মস্তিষ্কে বীর্যের পরিমাণ বাড়বে। পৃথিবীর সব দেশে সব ধর্মে সেই কারণে ব্রহ্মচর্যকেই বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেযুগের সমস্ত ছাত্র সেই কারণেই গুরুগৃহে এসে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিত। রূপে, গুণে, শিক্ষায়, ধীশক্তিতে মহান হয়ে উঠত। যৌবনে সবাই এক একজন দিকপাল। যেমন শ্রুতিধর, তেমনি স্মৃতিধর। একেই বলে মেধা। সেই গুরুকুল নষ্ট করেছে আধুনিক সভ্যতা। সত্যকাম গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলেন। গুরু কি করলেন? লেখাপড়ার পরিবর্তে সত্যকামকে একপাল গরু দিয়ে আদেশ করলেন, সত্যকাম, এই গরু নিয়ে তুমি বনে চলে যাও! এই গরু চরানোই তোমার কাজ। গুরুর আদেশ। সত্যকাম গরুর পাল নিয়ে বনে চলে গেল। কোনও প্রশ্ন নেই। গুরুর

আদেশ পালন করাই শিষ্যের কর্তব্য। অনেক দিন পরে সেই অরণ্যে সত্যকামের গরু সংখ্যায় বেড়ে দ্বিগুণ হল। তখন সত্যকামের মনে হল, এইবার কি আমার ফেরার সময় হল না! কতদিন হল, পড়ে আছি এই অরণ্যে গরুর পাল নিয়ে। আসল কাজ তো কিছুই হল না। সত্যকাম গুরুগৃহে ফিরে আসছেন। এমন সময় সেই পালের একটা গরু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিতে শুরু করল। রাতে অরণ্যের প্রান্তে আগুন জেবলেছিলেন, সেই আগুন তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন। অন্যান্য পশুরাও এসে সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে গেল। সত্যকাম গুরুগৃহে ফিরে আসা মাত্রই, গুরু তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারলেন, শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। উপনিষদের এই কাহিনীটি একটি রূপক। আসল কথা হল, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে জীবনের যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলছেন জানো—একজন জ্বলন্ত মানুষের কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। তার মানে ছেলেবেলা থেকেই নিজেদের সৎসঙ্গে, সাধুসঙ্গে রাখো। জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখো। স্বামীজী বলছেন, 'মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ', তুমি পড়লে। পড়লে হবে না। অভ্যাস করতে হবে। পুরোপুরি ব্রহ্মচারী হতে হবে। তবেই তো শ্রদ্ধা আসবে, বিশ্বাস আসবে। শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস না এলে মিথ্যা কথা কেন বলবে না। স্বামীজী বলছেন, আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী মানুষই শিক্ষক হয়েছেন। বিদ্যার প্রচার করেছেন। এই ত্যাগীরা যতদিন বিদ্যাদান করেছেন ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল। স্বামীজী বলেছেন, প্রাচীনকালের গুরুগৃহবাস ও অন্যান্য যে-সব প্রথা ছিল, সেইসব আবার ফিরিয়ে আনো। ইওরোপের আধুনিক বিজ্ঞান আর আমাদের বেদান্তকে মেলাও। মূলমন্ত্র হোক ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা গোছের শিক্ষা একেবারে তুলে দিতে হবে। কেউ কারোকে শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষক শেখাচ্ছেন মনে করাটাই ভুল। বেদান্ত বলছেন, মানুষের ভেতরেই সব আছে। একটি ছেলের ভেতরও সব আছে। শিক্ষকের কাজ কেবল সেইগুলিকে জাগিয়ে তোলা। স্বামীজী বলেছেন, মানুষের ভেতরে যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তার প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা।

অধ্যাপক উঠে দাঁড়ালেন। এধার থেকে ওধার পায়চারি করলেন কয়েকবার। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের শিক্ষক নই। আমি তোমাদের জিনিস তোমাদেরই ভেতর থেকে বের করে আনবো। সেই ম্যাজিকের মতো। ম্যাজিসিয়ানের হাতে টুপি। টুপির ভেতর থেকে রুমাল, মাফলার, পায়রা, খরগোস হাত ঢোকাচ্ছেন আর বের করছেন। সবাই অবাক। সামান্য একটা টুপির ভেতর এক সব ছিল! তোমাদের ভেতর থেকে একে একে সব বের করবো। তোমরা নিজেরাই অবাক হয়ে যাবে।'

সেইদিন গভীর রাতে পঞ্চানন তলায় ফকির আর বিশুদা দু'জনে মিলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন তৈরি করলেন। গভীর রাতে মাটিতে ঝুপঝুপ করে কোদাল পাড়ার শব্দ। মশালের আলো কাঁপছে গাছের ডালে ডালে। আমি আর অধ্যাপক পাশাপাশি শুয়েছিলুম দাওয়ায়। কানের কাছে মশার গানবাজনা। অধ্যাপক শুয়েশুয়ে বলছিলেন, 'সকলের সব জিনিস কি হয়! মশারা ভাবে আমরা মস্ত বড় গাইয়ে। রক্ত খাবার আগে গান শুনিয়ে মোহিত করে দিতে চায়। সেইটাই মহা বিরক্তিকর। নিঃশব্দে পোয়াটাক খেয়ে শুয়ে পড়, তা হবে না। কানের কাছে কীর্তন। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শোও বিলু। কাল থেকে গণ্ডায় গণ্ডায় লঙ্কা খাবো। মশারা জব্দ।' নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ অধ্যাপকের ঘুম আসছে না। তার ওপর মশা। অধ্যাপক জেগে শুয়ে আছেন। আমি শুয়ে শুয়ে পশ্চিম আকাশ দেখতে পাচ্ছি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হিলহিলে বিদ্যুৎ নয়। আকাশের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে চাপা একটা আলো গুমরে গুমরে উঠছে। কি ভয় করে আমার এই রাতে। সবই যেন অন্যরকম মনে হয়। সাধু মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, মনে করবে তুমি বিষ্ণুর পায়ে মাথা রেখে শুয়ে আছ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রী-বিষ্ণু তোমার মাথার শিয়রে জেগে আছেন। অনেক দূরে সেই পাঁচটি গাছের জটলা, অধ্যাপক যার নাম রেখেছেন পঞ্চাননতলা সেইখানে ফকির আর বিশুদা রাত কাটাচ্ছেন। সাংঘাতিক রহস্যময় পঞ্চমুন্ডীর আসন পাতা হচ্ছে। কত সাধনা হবে ওই আসনে। পশ্চিম আকাশ ওই কারণেই মনে হয় চমকাচ্ছে।

অধ্যাপক বললেন, বিলু, যোগীরা চিৎ হয়ে শোন্। সংসারীরা শোয় বাঁপাশ ফিরে আর ভোগীরা উপুড় হয়ে। তুমি এখন থেকে চিৎ হয়ে শোয়া অভ্যাস করো।

'আজ্ঞে, আমি চিৎ হয়েই শুয়ে আছি।'

'আমিও। তুমি এখন কি ভাবছো?'

'আমি ভাবছি কখন ভোর হয়।'

'কেন? ভোরের কথা ভাবছো কেন? আমাদের এখনও তো ঘুমই হল না।'

'এখানে আমরা খুব একটা ঘুমোই না। সাধুজী আমাদের প্রায়ই জাগিয়ে রাখেন। বলেন, রাতে জেগে থাকলে অনেক কিছু পাওয়া যায়।'

'কি পাওয়া যায় বিলু?'

'ঘুমিয়ে থাকলে যা পাওয়া যায় না।'

'বাঃ, এইটা তুমি সুন্দর বলেছ। ঘুমিয়ে থাকলে যা পাওয়া যায় না। এটা কি তোমার কথা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি তো বেশ মজার ছেলে! আমার একটা গান আসছে। গাইবো? আস্তে আস্তে।'

'করুন না।'

'এই গানটা বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশবাবুর লেখা। চৈতন্যলীলাতে আছে।'

অধ্যাপক গাইতে লাগলেন ঃ

আর ঘুমায়ও না মন,
মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন।
কে তুমি কি হেতু এলে,
আপনারে ভুলে গেলে।
চাহরে নয়ন মেলে ত্যাজ কুস্বপন,
রয়েছ অনিত্যধ্যানে।
নিত্যানন্দ হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ-তপন ॥

অধ্যাপকের যেমন সুন্দর গলা তেমনি সুন্দর সুর। গাইতে গাইতে

বিভোর হয়ে উঠে বসলেন। এক সময় বললেন, 'তুমি গান জানো না?'

'এমনি এমনি হুঁ হুঁ করি। পাঁচুঠাকুরের সঙ্গে আগে গাইতুম।'

'পাঁচুঠাকুর কে?'

'আমরা তাঁকে ভীষণ ভালবাসতুম। সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে এখানে এসেছিলেন। হঠাৎ একদিন ঈশ্বরকে ধরতে সেই যে ছুটে বেরিয়ে গেলেন আর কোনও খবর নেই। সে প্রায় অনেক দিন হয়ে গেল।'

'ঈশ্বরকে যে ধরতে যায় সে আর ফেরে না বিলু।'

অধ্যাপক স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললেন।

'ঘুমোলে না কি?'

'অল্প, অল্প।'

'বাঃ, এটাও ভাল বলেছ। অল্প অল্প ঘুম। চেতন অর্ধচেতন অচেতন। একটু একটু করে ডুবে যাওয়া। তোমার মতো বয়সে আমিও মাঝে মাঝে জেগে থাকতুম। কারোকে কিছু না বলে চুপিচুপি বেরিয়ে যেতুম রাস্তায়। কেন বলো তো? শুনেছিলুম আরব দেশে রাজারা গভীর রাতে ফকির সেজে মানুষের অবস্থা দেখতে বেরোতেন, কে সুখে আছে কে দুঃখে আছে। আমার মনে হত আমাদের দেশের রাজাও ওইরকম ছদ্মবেশে বেরোন। আমরা ঘুমিয়ে থাকি বলে জানতে পারি না। তখন ছোট ছিলুম তো তাই জানতুম না রাজা কাকে বলে, কোথায় তিনি থাকেন। শুধু ছবিতে দেখেছি। মাথায় মুকুট জরির পোশাক। এখন যেমন জানি না, ভগবান কোথায় আছেন। শুধু জানি তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের রাজা। তিনি রাজার রাজা মহারাজা। অন্তরে জেগে থাকলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। "মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে / চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে / গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া / সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে।" বিলু, কি কবিই জন্মেছিলেন আমাদের দেশে! রবীন্দ্রনাথ। সর্বকালের শ্রেষ্ঠকবি। একবার আমার সঙ্গে তাঁর সামনাসামনি দেখা হয়েছিল। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। দেবতা দেখিনি, মনে হয়েছিল দেবতার মতো দেখতে। কি তাঁর রূপ বিলু। জানো তো অন্তরে তিনি জাগলে বাইরে মানুষের অমন রূপ হয়। একদিন গভীর রাতে আমি আর আমার বন্ধু অনুপ দুজনে বেরিয়েছি। অনুপ বলেছিল, গভীর

রাতে ভগবান পৃথিবীতে নেমে আসেন। ভাগ্যে যদি থাকে দেখা হয়ে যাবে। আমরা দুজনে ভয়ে, ভয়ে চুপি চুপি হাঁটছি। চারপাশ একেবারে নির্জন, অন্ধকার। গাছপালা সনসন করছে। আকাশ যেন তেপান্তর। ঝাঁকড়া একটা বটের তলায় এসেছি। নাকে এল ধূপের গন্ধ। মিটিমিটি একটা প্রদীপ জ্বলছে বটের কোটরে। কেউ কোথাও নেই। আমরা পায়েপায়ে এগিয়ে গেলুম। কে কাকে পুজো করে গেছে। জবাফুল, বেলপাতা, এক থোক মাথার চুল, একটা শাঁখা। অনুপ বললে তুকতাক। সঙ্গে সঙ্গে মার দৌড়। তীর বেগে দৌড়োতে শুরু করলুম। কে যেন কোথায় হাহা করে হেসে উঠল। মনের ভুল কি না জানি না। বিলু তুমি ঠিকই বলেছ, রাতের পৃথিবীতে কত কি যে ঘটে! অন্ধকার এক অদ্ভুত আবরণ! তুমি কোনও দিন কিছু দেখো নি?'

'আমাকে আর ছবিকে একদিন একটা বীর হনুমানে ঠাস ঠাস করে চড় মেরেছিল।'

'রাতে হনুমান?'

'হ্যাঁ, বিশাল এক হনুমান। গাছ ঠেসান দিয়ে বসেছিল। আমরা ভেবেছি কোনও লোক। ছবি ভালোভাবেই জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল, কে গো তুমি? চট করে উঠে এসে এক চড়। ছবির সে কি অভিমান—তুমি রামের বাহন হয়ে আমাকে চড় মারলে মহাবীর! রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে আমি বলে দোবো! কী আশ্চর্য! মহাবীর তখন মানুষের মতো ছবির পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।'

'বলো কী?'

'সত্যি বলছি। আর একদিন দেখি কী, লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে অদ্ভুত সুন্দর এক মহিলা হন হন করে হেঁটে যাচ্ছেন। ছবি বললে, মা সরস্বতী। আমরাও পেছন পেছন হাঁটছিলুম। হঠাৎ কি হল, আমাদের শরীর পাথরের মতো ভারি হয়ে গেল। কুয়াশার মতো সাদা একটা পর্দা নেমে এল চোখের সামনে। কোথায় তিনি চলে গেলেন। আমরা কতক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়েছিলুম তাও জানি না। হঠাৎ দেখি ভোর হয়ে গেছে। আর একদিন দেখেছিলুম দুটো লোক একটা তক্তাপোস মাথায় করে ছুটছে। তারা চোর। আমরা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলুম।

'তোমরা এখন আর বেরোও না ?'

'আমরা এখন বদলে গেছি। ছবি অনেক বড় হয়ে গেছে তো!'

'তা ঠিক! শোনো এবার থেকে আমরা দু'জনে মাঝেমাঝে বেরবো। কেমন, রাজি তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার খুব ভাল লাগে। আমার তো কেউ নেই, রাত আব পথই আমার বন্ধু।'

।। এগার ।।

সন্ন্যাসী মহারাজ কোথা থেকে একটা হারমোনিয়াম আনালেন। ঠাকুরঘরের মেঝেতে কম্বল। কম্বলের ওপর হারমোনিয়াম। সন্ন্যাসী বসে আসে আছেন কিছু দূরে। আমরা সবাই বসে আছি মেঝেতে গোল হয়ে। গোকুলবাবা একটা গানের কলি গুনগুন করছেন। কেন জানি না, বাবার শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে আর সে প্রাণ নেই। আমার মনে হয় টাকা-পয়সার একটু অভাব যাচ্ছে। ভগবানের মতো ভাল মানুষ হলে কি হবে, অনেক শত্রু আছে। মানুষের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে না পারলে শত্রু তো হবেই। বাবা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। কেবল বলেন, আমি আমার পথে চলে যাবো, কে শত্রু হল, কে বন্ধু হল আমার জানার দরকার নেই। আমি ভাবি, কবে বড় হব। কবে একটু সাহায্য করতে পারবো বাবাকে। বলতে পারবো, বয়েস হয়েছে আপনার, এইবার আপনার ছুটি। আপনি আরাম করুন। আমি খাটি।

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'প্রোফেসার, হারমোনিয়ামের সামনে চলে যাও। আজ তোমার গান শুনবো। কাল গভীর রাতে তুমি খুব সুন্দর গান করছিলে।'

'ছি, ছি, আপনি তখন হয়তো ধ্যানে বসেছিলেন!'

'তা হয়তো বসেছিলুম।'

'আপনার অসুবিধে করে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন।'

'অবশ্যই করবো যদি একটা গান শোনাও।'

'মহারাজ, আমি যে হারমোনিয়াম বাজাতে পারি না।'

'বেশ, আমি বাজাচ্ছি।'

সন্ন্যাসী মহারাজ হারমোনিয়ামের সামনে এসে বসলেন। ঝরঝর করে পর্দার ওপর দিয়ে হাত চালিয়ে এমন এক সুরের খেলা খেললেন, আমরা সবাই আহা, আহা করে উঠলুম। সন্ন্যাসী মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, 'বুঝলে, এই হল সুর। মনে একেবারে তারের মতো গিয়ে লাগে। প্রোফেসার, এদিকে দেখ। এই পর্দাটা টিপছি। সুরটা শোনো। এটা হল সা। এর আর অন্যরকম হবার উপায় নেই।। সা

সা-ই। সা মানে সাধনা। পরেরটা শোনো রে। রে মানে আহ্বান, ডাক। ওরে আয় রে! রে আবার দুটো—তীব্র আর কোমল। একটা হল ডাকাবুকোদের ডাক। আয় রে! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ এই 'রে' হল বীরের আহ্বান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে কোমল রে-তে ডেকেছিলেন, দেখা দে মা, দেখা দে মা। চোখের জলে ডাকা। আর কবে দেখা দিবি মা, হর-মনোরমা! শেষে তীব্র 'রে'। রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিবি না! মায়ের হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় বসাতে গেলেন। রামপ্রসাদ যেমন বললেন, আয় মা সাধন-সমরে। দেখি মা হারে কি পুত্র হারে! এর পরের পর্দা হল গা। গাও, গেয়ে যাও। কি গাইবে? গাইবে মায়ের নাম। এই যে পরের পর্দা। গা মা। গাইলে মা পাবে। গা মা পা। গায়ের পরে মা, মায়ের পরে পা। আগেও না পরেও নয়। যার পরে যা। পেলেই হবে না। ধারণা করে থাকো। তাই তো পায়ের পরে ধা। ধরে রাখো। তাহলেই নিবৃত্তি। নিবৃত্তির পরেই চড়া সা। আরোহণ। সমাধি। ঠাকুর বলছেন, সমাধিতে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। নি-তে নেমে আসতে হয়। নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করো, মাঝে মাঝে সমাধি ছুঁয়ে এসো। এই যে সা থেকে সা, আরোহণ, অবরোহণ, এ একবারই স্থির হয়ে আছে। এই গতি। মানুষের হাতে তিনি তুলে দিয়েছেন চিরকালের জন্যে। অন্যথা হবার উপায় নেই। এই পৃথিবীর সব কিছু মানুষ পেয়েছে তাঁর কৃপায়। তিনি যখন দিয়েছেন তখনই পেয়েছে। তার আগেও নয় পরেও নয়। জীবন-সাধনায় মানুষ পেয়েছে কৃপা! ধারণ করেছে। তুলে দিয়েছে উত্তর কালের হাতে। প্রাপ্তি একবার, ব্যবহার বার বার। আত্ম-অহঙ্কারে কৃপা ভুলেছে। ভেবেছে, আমিই করছি। ঠাকুর বলছেন এই হল মতুয়ার বুদ্ধি। তুমি কি করবে? তিনি না নড়ালে, তোমার গাছের একটা পাতা নাড়াবারও ক্ষমতা নেই। তিনি তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন। বোঝো ভালো। বুঝলে আনন্দ পাবে। যে-আনন্দ পাওয়ার জন্যে মানুষ পাগল। না বুঝলেও তাঁর কিছুই যায়-আসে না। তাঁর কর্ম তিনি হাসতে হাসতে করে যাবেন। তুমি বুঝলে না বলে তাঁর কোনও অভিমান নেই। তোমার না-বোঝাটাও তাঁরই ইচ্ছা।

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

'ঈশোপনিষদের এই প্রার্থনার অর্থ হল, সত্যের মুখ যেন একটি সুবর্ণপাত্র দ্বারা আবৃত আছে। আবৃত মানে আমাদের চৈতন্যের আড়ালে আছে; কারণ আমরা মনোময় রাজ্যের জীব। আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান নাম আর রূপের মধ্যেই আবদ্ধ। এটাও জ্ঞান লাভের পথ। সে-জ্ঞান হল জাগতিক জ্ঞান। নামরূপের জ্ঞান। নামরূপের আড়ালে প্রকৃত যে-সত্য আছে তার সন্ধান দেয় না। নামরূপের আড়ালে যে সত্য আছে, তা আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র। নামরূপের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। সত্তার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আমরা প্রকৃত সত্যে পৌঁছতে পারি যদি সূর্য, সূর্য মানে সত্যদ্রষ্টা, আমাদের চেতনা থেকে নাম ও রূপের জ্ঞান অর্থাৎ হিরণ্ময় পাত্রটি দয়া করে সরিয়ে নিয়ে, তার বদলে আত্মদৃষ্টি ও সমগ্রের দৃষ্টি দান করেন।

'সকলের তো এই সত্যকে জানার আগ্রহ হবে না বাবা। ক'জনের মনেই বা এই প্রশ্ন জাগবে;

কোঽহং কথমিদং জাতং কো বৈ কর্তাঽস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥

'আমি কে? এই জগৎ এল কোথা থেকে। জগতের কর্তা কে? জগতের উপাদানই বা কি? আমি, আমার, এই নিয়েই তো বেশ মেতে থাকা যায়। এই দেহকে ঘিরেই তো চলেছে আজীবন তাণ্ডব। এরই নাম তো বাসনা। অধ্যাত্মবিদ্যার বিচারই হল জ্ঞান। দুধের মধ্যে যেমন ক্ষীর থাকে ওই জ্ঞানের মধ্যেই আছে ব্রহ্মজ্ঞান—মাধুর্যং পয়সো যথা।

'ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরের দিকে এক পা এগোলে, তিনি একশো পা এগিয়ে আসবেন। এই এক পা মানে, তোমার ওই জিজ্ঞাসা। গিরিশ ঘোষ তাঁর গানে যে প্রশ্ন রেখেছেন - কে খেলায় আমি, খেলি বা কেন? ঠাকুর বলছেন, চুম্বক পাথর সূচকে টানবে। না টেনে উপায় নেই। লোহাকে চুম্বক ডাকে না, আমার কাছে এসো। আপনিই টেনে নেয়, এসো বলতে হয় না। টানে ছুটে আসে লোহা। ঠাকুর বলছেন, কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ওই দুটি গেলেই যোগ। আত্মা-পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি সূচ। তিনি টেনে

নিলেন যোগ। কিন্তু সূচে যদি মাটি মাখা থাকে চুম্বক টানে না; মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কামিনী-কাঞ্চন মাটি পরিষ্কার করতে হয়।'

লকবাবু বললেন, 'কি ভাবে পরিষ্কার হয়?'

'ঠাকুরই বলে গেছেন, তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো সেই জল মাটিতে লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বক টেনে নেবে। যোগ তবেই হবে। তাঁর জন্যে কাঁদতে পারলে দর্শন হয়। সমাধি হয়। যোগে সিদ্ধ হলেই সমাধি। কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয়। তারপর সমাধি। আর এক আছে ধ্যান। সহস্রারে শিব বিশেষ রূপে আছেন। তাঁর ধ্যান। শরীর সরা, মন বুদ্ধি জল। এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব সূর্যের ধ্যান করতে করতে সত্যসূর্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়। পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধার দাড়ি পাওয়া গেল।'

সাধুজী হাহা করে হাসলেন। অদ্ভুত সুন্দর এক মুখে আমাদের দিকে তাকালেন। হঠাৎ পাকা ওস্তাদের মতো, এধার থেকে ওধার এক ঝটকা হারমোনিয়াম বাজালেন। আহা সে কি সুর! যেন মিছরির দানা। গলা মেলালেন। জীবনে অনেকের গান শুনেছি, অমন গলা, অমন গান শুনিনি আর। আমার এই শূন্য জীবনে তিনটে জিনিসের জন্য বড় বেদনা। আমার অতীত, আমার পাঁচু ঠাকুর, আমার সাধুবাবা, আর সেই মহা তিনি, যিনি বারে বারে আমাকে মহাজীবনের দোর গোড়া থেকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

সন্ন্যাসী মহারাজ গাইতে লাগলেন:

হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণে
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন।
চিদানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে হও রে চিরমগন।
চিদানন্দরসে, হায় রে, প্রেমানন্দরসে ॥

গাইতে, গাইতে সাধুজী কোন্ জগতে চলে গেলেন। দু' চোখে জলের ধারা। অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল। কোথা থেকে উড়ে এল হলুদ রঙের একটা পাখি। জানালায় বসে শিস্ দিতে লাগল। আমরা

অবাক। পাখি তার নীল আকাশ ভুলে, উড়ে এল গানের আকাশে। মানুষের ভয় নেই। সাধুজী সেই পাখির দিকে জল ভরা চোখে তাকিয়ে, তাকেই যেন গান শোনাতে লাগলেন। পাখির সে কি আনন্দ !

গান শেষ হল, উড়ে গেল পাখি।

সাধুজী বললেন, 'এই গান স্বামীজী শুনিয়েছিলেন ঠাকুরকে। ঠাকুর বলতেন ভাবটাই সব। ভাব সাধন। সেদিন কবে বা হবে, হরি, বলতে ধারা বেয়ে পড়বে, সেদিন কবে বা হবে !!'

সাধুজী আবার গান ধরলেন, 'সংসার বাসনা যাবে, সেদিন কবে বা হবে। অঙ্গে পুলক হবে, সেদিন কবে বা হবে।'

'ভাব থেকে মহাভাব শেষে আবির্ভাব।'

সারা ঘরে ফুলের গন্ধ। ফুল নেই তবু গন্ধ। আমি জানি, এ গন্ধ সাধুজীর শরীর থেকে বেরচ্ছে। সেই বয়সেই সাধুজী পবিত্র জীবনের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কেবলই মনে হয়, আমার কবে হবে। কবে আমি ফুল হব ! ধূপ হব ! প্রদীপ হব ! নৈবেদ্য হব ! রুদ্রাক্ষ হব। তুলসীর মালা হব। নামাবলী হব। সাধুর কাঁধের কম্বল হব ! হাতের কমণ্ডলু। বড় অশান্তি, কেন পারছি না !

সাধুজী সেদিন ঠাকুরের ভাবসাধনার কথা বলেছিলেন, 'কী অবস্থাই গেছে ! হরগৌরী ভাবে কত দিন ছিলুম। আবার কতদিন রাধাকৃষ্ণ ভাবে। কখনও সীতারামের ভাবে ! রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কত্তুম, সীতার ভাবে রাম রাম কত্তুম। তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বললুম, মা, এসবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নেই, এমন অবস্থা করে দাও। তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এইভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘর থেকে বার করে দিলুম। তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম। পুজো উঠে গেল। এই বেলগাছ ! বেলপাতা তুলতে আসতুম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এল। দেখলাম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হল। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি আর সেরকম করে তুলতে পারিনে। তখন রোক করে তুলতে গেলুম। আমি লেবু কাটতে পারি না। সেদিন অনেক কষ্টে, 'জয়কালী' বলে তাঁর সামনে বলির মতো করে তবে কাটতে পেরেছিলুম। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে

গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সামনে বিরাট-পূজা হয়ে গেছে।—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হল না। তিনি মানুষ হয়েও লীলা করছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘষতে ঘষতে যেমন আগুন বেরোয় ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বরদর্শন হয়। তেমন টোপ হলে বড় রুইকাতলা কপ্ করে খায়। প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ। তখন উন্মাদ অবস্থা। গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে।'

বিশুদা খুব মন দিয়ে সব শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন: 'আমি অতসব বুঝি না। আমি চাই।'

মহারাজ বললেন, কি চাও?'

'শক্তি চাই মহারাজ।'

'কি শক্তি? দেহের শক্তি? তাহলে ডন বৈঠক মারো।'

'আপনার আশীর্বাদে, দেহে আমার পশুর শক্তি। আমি সেই শক্তি চাই, যে শক্তিতে মানুষ আকাশে উড়ে যায়। ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এক মুঠো ধুলো তুলে মন্ত্র পড়ে গায়ে ছুঁড়ে দিলে মানুষটা পাথর হয়ে যাবে।'

মহারাজ হা-হা করে হেসে বললেন, 'তুমি ধর্ম বলতে এই বোঝ না কি! তাহলে একটা গল্প শোনো, এক সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল, আর সেই জন্যে অহঙ্কার হয়েছিল কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিলেন আর তপস্যাও ছিল। ভগবান ছদ্মবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন তাঁর কাছে এলেন। এসে বললেন, "মহারাজ! শুনেছি আপনার খুব সিদ্ধাই হয়েছে।" সাধু খাতির করে তাঁকে বসালেন এমন সময় একটি হাতি সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তখন নতুন সাধুটি বললেন, "আচ্ছা মহারাজ, আপনি মনে করলে এই হাতিটিকে মেরে ফেলতে পারেন?" সাধু বললেন, "য়্যাসা হোনে সেক্তা।" এই বলে ধুলো পড়ে হাতিটার গায়ে দেওয়াতে সে ছটফট করে মরে গেল। তখন যে সাধুটি এসেছেন তিনি বললেন, "আপনার কি শক্তি! হাতিটাকে মেরে ফেললেন!" উনি হাসতে লাগলেন। তখন

নতুন সাধুটি বললেন, "আচ্ছা, হাতিটাকে আবার বাঁচাতে পারেন?" তিনি বললেন. "ও ভি হোনে সেকতা হ্যায়!" এই বলে আবার যেই ধুলো পড়ে দিলেন, অমনি হাতিটা ধড়ধড় করে উঠে পড়ল। তখন এ সাধুটি বললেন, "আপনার কী শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি এই যে হাতি মারলেন, আর হাতি বাঁচালেন, আপনার কি হল? নিজের কী উন্নতি হল? এতে কি আপনি ভগবানকে পেলেন?" এই বলে অন্তর্ধান হলেন।

'বাবাজী, ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সূচের ভিতর সুতো যাওয়া একটু রোঁ থাকলে হয় না। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই আমাকে যদি লাভ করতে চাও, তাহলে অষ্ট সিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে হবে না। কি জান? সিদ্ধাই থাকলে অহংকার হয়, ঈশ্বরকে ভুলে যায়। সিদ্ধাইয়ের কোনও দাম নেই। দুটো যোগ আছে হঠযোগ আর রাজযোগ। হঠযোগী শরীরের কতকগুলো কসরৎ করে। উদ্দেশ্য সিদ্ধাই দীর্ঘ আয়ু হবে, অষ্টসিদ্ধি হবে। ধন, জন, মান, সম্মান, শিষ্য-সামন্ত, গদি, তাকিয়া, পদসেবা, ফলমূল, গরদ, সন্দেশ। আর রাজযোগ! রাজযোগের উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। রাজযোগই ভাল। এই হল পরমহংসের কথা। আবার বেদান্তের সপ্তভূমি, ওদিকে যোগশাস্ত্রের ষড়যন্ত্র অনেক মেলে। বেদের প্রথম তিন ভূমি। ' আর ওদের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। এই তিন ভূমিতে,—তিন ভূমি হল, গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি,— এইখানেই সাধারণ মানুষের মনের বাস। মন যখন চতুর্থ ভূমিতে ওঠে, অর্থাৎ অনাহত পদ্মে, জীবাত্মাকে তখন শিখার মতো দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধক বলেন, এ কী এ কী! পঞ্চম ভূমি হল বিশুদ্ধচক্র। বিশুদ্ধ চক্রে মন গেলে, কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছে করে। ষষ্ঠভূমি হল আজ্ঞাচক্র। সেখানে মন গেলে ঈশ্বরদর্শন হয়। কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভেতর আলো। ছুঁতে পারে না। মাঝে কাচ ব্যবধান আছে বলে। জনক রাজা পঞ্চমভূমি থেকে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্র থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। তিনি কখনও পঞ্চম ভূমি, কখনও ষষ্ঠভূমিতে থাকতেন। এই হারমোনিয়ামের পা আর ধা। ষড়চক্র ভেদের পর সপ্তমভূমি। সহস্রার—সা, মন সেখানে গেলে, মনের লয় হয়। জীবাত্মা, পরমাত্মা এক হয়ে যায়। সমাধি হয়। দেহবুদ্ধি

চলে চলে যায়। বাহ্যশূন্য হয়। নানা জ্ঞান চলে যায়। বিচার বন্ধ হয়ে যায়। হয়, এসব হয়। ত্রৈলঙ্গস্বামী বলেছিলেন বিচারে অনেক বোধ হচ্ছে ; নানা বোধ হচ্ছে। সমাধির পর শেষে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কিন্তু বাবা কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না।'

মহারাজ মৃদু হাসছেন। বিশুদা বসে আছেন হাঁ হয়ে।

অধ্যাপক এইবার কিছু বলবেন।

।। বারো ।।

অধ্যাপক বললেন. 'আমার তেমন জ্ঞানগম্মি নেই, তবে শুনেছি দুটি পথ আছে, একটি হল পিপীলিকা মার্গ, আর একটি হল বিহঙ্গম মার্গ বা শুকমার্গ।'

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'ঠিকই শুনেছ। উপনিষদে আছে। সকলেই সেখানে পৌঁছবে, কেউ আগে আর কেউ পরে। এ হল জন্মজন্মান্তরের খেলা। পিপীলিকা মার্গটা কি জানো? পিঁপড়ে যেমন ধীরে ধীরে এগোয়। এগোতে, এগোতে হঠাৎ মিষ্টির সন্ধান পায়। খেয়ে তার জীবন জুড়োয়। সাধারণ অধিকারী হল ওই পিঁপড়ের মতো। বহু জন্ম ধরে, ধীরে ধীরে, শমদম অভ্যাস করে, নিষ্কাম কর্ম করে, উপাসনায় একটু একটু করে শুদ্ধচিত্ত হয়ে, জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করে, এক জন্মে হঠাৎ পেয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। একে বলে—ক্রমমুক্তি, ক্রমশ মুক্তি। সকলেরই হবে; কিন্তু কোন্ জন্মে? আর বিহঙ্গম মার্গ বা শুকমার্গ, সে বেশ মজার। খুবই বিরল। লক্ষে এক, তাও হয় কি না সন্দেহ! রামপ্রসাদের গানে আছে, ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি। শুকমার্গ মানে, সেই শুকপাখি। হঠাৎ উড়ে এল। গাছের পাকা ফল। ব্রহ্ম বৃক্ষে আত্মজ্ঞানের ফল। সোজা সেই ফলে ঠোঁটের আঘাত। কোনও দিকে দৃকপাত নেই। ফলটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হল পাখি। কোনও কোনও অধিকারী এই শুকপাখির মতো। এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁদের আর সাধন ভজন শমদম কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ জনকরাজা। মহারাজ জনক একদিন তাঁর বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় তাঁর কানে এল সিদ্ধগীত। সারা মন ছেয়ে গেল বৈরাগ্যে। ফিরে এলেন প্রাসাদে। শুরু হল আত্মবিচার। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হল। তিনি হলেন 'ব্রহ্মর্ষি'। শুক-মার্গে সদ্যোমুক্তি।

'এইবার মন দিয়ে শোনো, সবচেয়ে বড় কথা হল—কৃপা। কৃপাই সব। কি কৃপা? আত্মকৃপা, শাস্ত্রকৃপা, গুরুকৃপা আর ঈশ্বরকৃপা। এই চার কৃপা এক হলে তবেই হবে। এই তালার চার চাবি,

চারখানে রয়েছে। মাত্র একটি চাবি আছে আমার কাছে। সেই চাবির নাম আত্মকৃপা। আমার নিজের ভেতরেই ভয়ঙ্কর একটা ইচ্ছা জাগবে। নিজেকেই নিজে ঠেলতে থাকবো সেইদিকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় বলি মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। আমি কে, ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিস নেই। হাত, পা রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার কল্লে আমি বলে কিছুই পাইনে! শেষে যা থাকে, তাই আত্ম-চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। ঠাকুর বলছেন, যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে, ততক্ষণ চন্দ্রসূর্যের প্রতিবিম্ব তাতে ঠিক ঠিক দেখা যায় না, তেমনি মায়া অর্থাৎ আমি এবং আমার এই জ্ঞান যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ আত্মার সাক্ষাৎকার ঠিক ঠিক হয় না। ঠাকুর বলতেন, মানুষ দু-রকম—মানুষ ও মানহুঁশ। যাঁরা ভগবানের জন্য ব্যাকুল, তাঁদের মানহুঁশ বলে; আর যারা কামিনী-কাঞ্চনরূপ বিষয় নিয়ে মত্ত তারা সব সাধারণ মানুষ। বিবেক-বৈরাগ্য না থাকলে শাস্ত্র পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভও হয় না। এইটি সৎ আর এইটি অসৎ বিচার করে সদ্বস্তু গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা—এইরূপ বিচার-বুদ্ধির নাম বিবেক; বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।

'জীবের অনাদি ব্যাধিটি হল ভগবদ-বিমুখতা। এর জন্যে মহা-মায়াও আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন ভয়ংকর। সে শাস্তি হল—অস্মৃতি, বিপর্যয়। কেন এই ব্যাধির আক্রমণ? নিজের স্বরূপ ভোলা কিন্তু ব্যাধি নয়। মায়ার আক্রমণ। অপূর্ব একটি শ্লোক শোন। কি অসাধারণ—

অবিচারিত সিদ্ধেয়ং মায়া বেশ্যা বিলাসিনী।
পুরুষং বঞ্চয়ত্যেব মিথ্যাভূতৈঃ স্ববিভ্রমৈঃ ॥

'মায়া! সে কে? বেশ্যাতুল্য, যুক্তিহীন, প্রকাশরূপিণী, বিচিত্র বিলাসকারিণী। মিথ্যাভূত নানা বিভ্রম তৈরি করে আমাকে আজীবন বঞ্চনা করে চলেছে। আর একটি যথাসময়ে ধরতে পারার নাম আত্মকৃপা। আমরা এই মায়া-ব্যাধি সারাতে চাই না। বলি, বেশ আছি তোফা আছি ভাই। ভগবান তাই গীতায় বলেছেন – মনুষ্যাণাং সহস্রেষু

কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। হাজার, হাজার, কোটি, কোটি, মানুষ তার মধ্যে কোনও একজন সিদ্ধিলাভের জন্যে যত্ন করে। লক্ষে একটি দুটি কাটলে ঘুড়ি হেসে দাও মা হাত চাপড়ি। ঠাকুর বড় সুন্দর বলতেন—একেবারে চাবুকের মতো—বিষয়ী লোকদের মন গুবরে পোকার মতো। গোবরের পোকা গোবরের ভেতর থাকতে ভালবাসে। যদি গোবর ছাড়া তাদের কিছু দাও তা হলে ভাল লাগে না। জোর করে যদি পদ্মের ভেতর বসিয়ে দাও তা হলে তারা ছটফট করে মরে। বিষয়ী লোকদের মনে সেই রকম বিষয়-কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। যদি ঈশ্বরীয় কথা প্রসঙ্গ হয় তারা সে স্থান ত্যাগ করে যেখানে বাজে কথা হয় সেখানে গিয়ে বসে। ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন—কতকগুলো মাছ জালে আটকালে আদপে পালাতে চেষ্টা করে না, এমনি পড়ে থাকে; আবার কতকগুলি মাছ পালাবার জন্য লম্ফঝম্ফ করে, কিন্তু পালাতে পারে না। আবার একজাতীয় মাছ আছে, জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। এ সংসারে জীবও সেইরূপ তিন রকমের আছে—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত। শঙ্কর বলছেন, পৃথিবীতে তিনটি জিনিস দুর্লভ। প্রথম মনুষ্যজন্ম, দ্বিতীয় মুমুক্ষা, মুক্ত হবার ইচ্ছা তৃতীয় মহাপুরুষের সঙ্গ। শুধু মানুষ হলেই হবে না, হতে হবে মুমুক্ষু। একটা দোঁহা শোনো ঃ

আত্মাকো নদ মানিয়ে, সংযম তোয় সমান।
সত্যবচন হ্রদ, শীল তট, দয়া লহর করি জান ॥
অয়সা নদকা সলিলমে, করহু স্নান যুধিরাজ।
নহিঙ্গা এজন হোত হৈ শুদ্ধ চপল মনরাজ ॥

'গঙ্গায় চান করা কি জন্যে না পাপ ধুয়ে যাবে, দেহ-মন নির্মল হবে। মূর্খ, অবগাহনে কি চিত্তবৃত্তি নির্মল হয়! হয় না। মনের ময়লা দূর করার জন্যে কোথায় তাহলে অবগাহন করবে! কোন্‌ জলাশয়ে! কোন নদী! সে নদী হল তোমার আত্মা। আত্মাই নদী। সে নদীর জল হল সংযম, সত্যবাক্য হল হ্রদ। সুশীল হও। সুশীল মানে সৎস্বভাব, সচ্চরিত্র। সুশীলতাই হল সেই নদীর তট। দয়া হল লহর। ছোট ছোট ঢেউ, তরঙ্গ। অবগাহন যদি করতে চাও তো এই আত্মা-নদীতে অবগাহন করো, যে নদীর জল হল সংযম। সংযমই হল সার কথা।

আত্মকৃপার পর শাস্ত্রকৃপা। শ্রদ্ধা আর প্রেম বিকশিত হলে শাস্ত্রের

মর্ম মুমুক্ষুর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। একেই বলে শাস্ত্রকৃপা। ঠাকুর বলতেন, গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি-গাঁট। বিবেক বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা, অহংকারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র। তারপর? তারপর শাস্ত্রও ফেলে দিতে হবে। কেন? বইই বল আর শাস্ত্রই বল, এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পোঁছবার পথ বলে দেয়। পথ আর উপায় জেনে নেবার পর আর শাস্ত্রের কি দরকার। তখন নিজে কাজ করতে হয়। ঠাকুরের উপমা শোনো। কি সুন্দর। একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল। কুটুমবাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে, অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নেই। কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি! তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরোলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যাবে। তারপরই পাবার চেষ্টা। শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই ঘুরেফিরে সেই এক কথা। কেন জানো? ঈশ্বর এক। পথ এক। এক উপলব্ধি। জেন বৌদ্ধ ধর্মের একটা কাহিনী শোনো। বিখ্যাত এক জেন সন্ন্যাসীর নাম মু-নান। যেমন তাঁর সাধনা, তেমনি তার উপলব্ধি। এক সময় তাঁর বয়স হল। বুঝলেন ডাক এসেছে। যেতে হবে। তাঁর উত্তরাধিকারী হবার মতো আর একজনই ছিলেন সেই সময়। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য শোজু। শিষ্য শোজুকে নিজের ঘরে ডেকে এনে গুরু মুনান বললেন "আমার বয়স হয়েছে, যাবার সময় হল। যতদূর জানি শোজু একমাত্র তুমিই আমার শিক্ষার ধারাকে প্রবাহিত রাখার যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই দেখ সেই গ্রন্থ। গুরু পরম্পরায় এই গ্রন্থ আজ সাতপুরুষ নেমে এসেছে। এক গুরুর হাত থেকে আর এক গুরুর হাতে। প্রত্যেকেই এই গ্রন্থে তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান সংযোজন করেছেন। আমিও করেছি। বড়

মূল্যবান এই গ্রন্থ। এই মূল্যবান শাস্ত্রটি আমি তোমার হাতে তুলে দিলুম। আজ থেকে তুমিই আমার উত্তরাধিকারী হলে।" শোজু বললেন, "এই গ্রন্থ যদি এতই মূল্যবান তাহলে আপনিই বরং রাখুন। আপনার মুখ থেকে আমি যা পেয়েছি, যে কৃপা, তাই আমার কাছে যথেষ্ট। গুরুমুখী বিদ্যাতেই আমি তৃপ্ত।" গুরু মুনান বললেন, "সবই আমি জানি, তবু তুমি রাখো। প্রতীক হিসেবে। এক গুরু আর এক গুরু করে করে এই গ্রন্থ সাতপুরুষে চলে এসেছে। এর মূল্যই আলাদা।" তাঁরা দুজনে কথা বলছিলেন এক অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে। গুরু মুনান শোজুর হাতে বইটি দেওয়া মাত্রই, শোজু সেটি আগুনে ফেলে দিলেন। দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুনান জীবনে কখনও রাগ করেননি, এই প্রথম তিনি রাগে চিৎকার করে উঠলেন। "এ তুমি কি করলে?" শোজুও ঠিক একই গলায় বললেন— "এ আপনি কি বলছেন?"

'গল্পের মানেটা বুঝলে? জেন সন্ন্যাসীরা লিখিত শাস্ত্রের তোয়াক্কা করেন না। গুরুর মুখ থেকে আসে শিষ্যের কাছে। আমাদের শ্রুতির মতো। আমাদের ঠাকুরের কথা—পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে কিন্তু পাঁজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না, তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্মকথা লেখা আছে শুধু পড়লে ধর্ম হয় না—সাধন চাই। জেন সন্ন্যাসীরা সেই সাধনাই বুঝতেন। গুরুর প্রতি বিশ্বাস আর সাধনা। পুঁথিতে কি প্রয়োজন! তাই গুরু মুনান যখন ধমকে উঠলেন—কি করছো। শিষ্য শোজুও গুরুকে ধমকে উঠলেন—কি বলছেন আপনি? গুরু তাঁর ভুল বুঝে নিরুত্তর রইলেন।

'আত্মকৃপা, শাস্ত্রকৃপা আর গুরুকৃপা। কেন গুরুকৃপা? শাস্ত্রে তো সবই আছে। পড়বো, মন্ত্র মুখস্থ করবো, ঘণ্টা নেড়ে পুজো করবো। নাক টিপে বসে থাকবো। সবই হবে। কিন্তু আসল বস্তু লাভ হবে না। কারণ মন্ত্র হল বটের বীজ। বটগাছের তলায় লাল লাল অজস্র বটফল বিছিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু একটিও অঙ্কুরিত হয় না। সে বড় মজার নিয়ম। বীজ কোনও পাখিতে খাবে, পাকস্থলীর লালার সঙ্গে মিশবে। তারপর যেখানে পড়বে, এমন কি পাথরে পড়লেও চারা বেরোবে। সেইরকম ইষ্টমন্ত্র গুরুপাখিতে খাবেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞ সিদ্ধপুরুষের অনুভবলালা মিশবে, তারপর যতই পাষাণ হৃদয়

হোক না কেন, যেখনে পড়বে সেইখানেই প্রেমের অঙ্কুর হবে। শ্রী বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলছেন—

> মহানভাবসম্পর্কাৎ সংসারারার্ণবলঙ্ঘনে।
> যুক্তিঃ সংপ্রাপ্যতে রাম দৃঢ়া নৌরিব নাবিকাৎ ॥

হে রাম! সাগর পাড়ি দেবার জন্যে নৌকো তুমি কার কাছে পাবে? নাবিকের কাছে। সংসারও এক সমুদ্র। সেই সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে উপায়। নাবিকাৎ দৃঢ়া নৌঃ ইব। গুরুসঙ্গ, সৎসঙ্গ, গুরুকৃপা, গুরুসেবা। শঙ্কর বলছেন, ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা। সেই একই কথা। সেই একই নির্দেশ। গুরু চেনার উপায়। ভাগবত বলছেন—দুটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ ও ভগবদ্-জ্ঞানে নিপুণ। শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে হবে না, ভগবদ-জ্ঞানানুভবেরও প্রয়োজন আছে! কতকগুলো নল লাগিয়ে দিলেই বাড়ির কলে জল আসবে না। সরকারি নলের সঙ্গে তার যোগ থাকা চাই। গুরুর নলের সঙ্গে যোগ হল। শাস্ত্রজ্ঞানের পাইপ বসল। এইবার দেখতে হবে গুরুর সঙ্গে আসল উৎসের যোগ আছে কি না! তিনি নিবৃত্তি মার্গকে আশ্রয় করতে পেরেছেন কি না! মায়ার তরঙ্গ, প্রকৃতির তরঙ্গের হাবুডুবু থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন কি না! এইবার শোনো, গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক। যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধন-ভজনের প্রয়োজন মনে করে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। গুরুর জন্যে সাধকের চিন্তা করবার দরকার নেই।

॥ তেরো ॥

সারাটা দিন গুরুর নির্দেশে আমরা মৌনী। সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'কর্ম আর ধর্ম একসঙ্গে মেলাও। বোলকে মোল নাহি যো কহেনে জানে বোল। কথা অমূল্য। কার কথা? যে কথা বলতে জানে। তার এক একটি বাক্য অমূল্য রত্ন। হৃদয় তরাজ তৌলকে তুহু বোলকে খোল। উপায়টা কি? কথাকে রত্নসম করার উপায়। হৃদয় মেপে কথা বলার অভ্যাস করো। পরস্পর পরস্পরের হৃদয় পরিমাণ যন্ত্রে মেপে নাও আগে, তারপর হৃদয়ে হৃদয়ে কথা বলো। মৌনী না-হলে হৃদয়ের খোঁজ পাবে না। নিঃশব্দে কান পাতো। যাও, যে যার কাজে যাও। কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। পারলে কোনও কিছু চিন্তাও করবে না। যখনি চিন্তা আসবে, প্রতিটি চিন্তার ওপর একটি করে ওংকার বসাও। চিন্তাটাকেই মন্ত্র করে নাও। দেখবে কি মজা! এই পৃথিবীতে কত রকম ভাবেই না বাঁচা যায়! ধূপের মতো, ফুলের মতো, মন্দিরের মতো, আবার নর্দমার মতো।'

লকাবাবু হঠাৎ হাই তুললেন। সন্ন্যাসী মহারাজের কথা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি লকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিনা পরিশ্রমেই ক্লান্ত। কথা শোনার ক্লান্তি। মন লাগাও বাবাজী। আর মন যদি না লাগে সবই বৃথা। ছাড়হুঁ ছয় দোষ সদা যো চাহ কল্যাণ। নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ ভয় অলস দীর্ঘসূত্রান। নিজের মঙ্গল যদি চাও বাবাজী ছ'টি দোষ তোমাকে ছাড়তে হবে—ছ'টা দোষ কি কি? নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, ভয়, আলস্য আর দীর্ঘসূত্রতা। ছ'টা গুণ কি কি শুনবে? যা কখনো পরিত্যাগ করা উচিত নয়—অনালস্য অনসূয়া ক্ষমা ধৈর্য সত্য সুদান। পুরুষণ কো-গুণ ষষ্ঠ হোয়, নহি ছোড়হি হিত জাপ। অনালস্য অনসূয়া ক্ষমা ধৃতি অরু সত্য সুদান। ছ'টা গুণ তাহলে কি হল বাবা? অনালস্য, অনীর্ষা, ক্ষমা, ধৈর্য, সত্য আর দানশীলতা। সুখী কে? সুখের জন্যেও ছ'টি বস্তু বা অবস্থার প্রয়োজন। সবই ছয়ের খেলা গো - রোগরহিত ঋণরহিত ঘর বাসা। সজ্জন সঙ্গ হোত দিন খাশা। জ্ঞান মনন সুখ লহহি সদাহি। নির্ভয় বাস করহিঁ ঘর মাহিঁ। প্রথম হল গৃহসুখ, দ্বিতীয় হল দেহসুখ, দেহ যেন

রোগশূন্য থাকে, অঋণী, যার কোথাও কোনও ঋণ নেই, সে পরমসুখী, সৎসঙ্গ, সজ্ঞানে মনের সুখ উপলব্ধি আর নির্ভয়ে বাস।'

সন্ন্যাসী মহারাজ আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বেটা তুই তো সবে জীবন শুরু করতে চলেছিস। এখন থেকে দেখে শুনে পা ফেললে তোর হতে পারে, এই বুড়ো আর আধবুড়োদের কি হবে। এবারটা শুধু চাখা হবে পরের বার খাওয়া। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই কারণেই বলতেন—আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান? ছেলেবেলা তাদের মন ষোলআনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। বে হলে আটআনা স্ত্রীর উপর যায় ছেলে হলে আবার চারআনা তাদের প্রতি যায়, বাকি চারআনা মা-বাপ, মান-সম্ভ্রম, বেশ-ভূষা ইত্যাদিতে চলে যায়; এইজন্যে ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করে তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন।'

সন্ন্যাসী মহারাজ আমার চুলে হাত বুলিয়ে এলোমেলো করে দিতে দিতে বললেন, 'যাও, আজ সারাদিন কথা বন্ধ। আমরাও কেউ কথা বলব না। এই স্লেট আর পেনসিল রইল। কিছু বলার থাকলে লিখবে। লিখে জানাবে। দেখি কার কতো মনের জোর। সবই করবে, সকলের মধ্যে থাকবে, কিন্তু কথা নয়।'

ফকির মহারাজ ধেই ধেই করে খানিক নেচে নিলেন। বিশুদা মুখে বাঁধলেন গামছার ফেট্টি। লকাবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন আমি ঠোঁট চেপে ধরলুম। ছবি পুজোর যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি সোজা চলে গেলুম বাগানে। পঞ্চমুণ্ডীর আসনের কাছে। সুন্দর একটা বেদী তৈরী হয়েছে। মনে হয় পরে বাঁধানো হবে। এখন ঘাসের চাবড়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে। তার ওপর জবার মালা লকলক করছে। একপাশে পড়ে আছে একমুঠো ছাই। মনে হচ্ছিল বসে পড়ি আসনে। দেখি না কি হয়! দিন দুপুরে কি আর হবে! শুনেছি, মাঝরাতে বসলে আসন ঠেলে ফেলে দেয়। ভূত-প্রেত এসে গলা টিপে ধরে। ফকিরের ভয়ে বসতে পারলুম না। ফকির যেন জ্বলন্ত আগুন আর সন্ন্যাসী মহারাজ হলেন প্রদীপের শিখা। একপাশে মোটামোটা অনেক ডাল পড়েছিল। গাছের। কাটারি দিয়ে কাটতে বসে গেলুম। ফকির বলেছিলেন নিজেকে সবসময় খুব

খাটাবে। একদম ফেলে রাখবে না। ফেলে রাখলেই মনে মরচে ধরে যায়। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু সে নিজে। দুটো মন, একটা মন আর একটা মনকে অনবরতই কু-পরামর্শ দিচ্ছে। এমন পথে যেতে বলছে, যে পথে গেলে তার ক্ষতি হয়। লকাবাবু পুজোর বাসন মাজতে বসে গেছেন। বিশুদা আর অধ্যাপক লেগেছেন বাগানের কাজে। অধ্যাপক ঘাস আর আগাছা পরিষ্কার করছেন, বিশুদা কোদাল পাড়ছেন। আর ফকিরের সেই বিশাল কুকুরটা আমার কাঠ কাটা দেখছে।

হঠাৎ দেখি আশ্রমে ঢুকছেন মা, আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে। প্রথমেই সামনে পড়ে গেলুম আমি। মৌনী, তাই জিজ্ঞেস করতে পারলুম না, কি হয়েছে মা ? কাঁদছ কেন ? মা ধরা ধরা গলায় বললেন, 'সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তোরা বেশ আছিস। একবারও বাড়ির দিকে পা বাড়াস না।' বলেই মা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বসে পড়লেন আমার সামনে। আমার আর মৌনী থাকা হল না। কাটারি ফেলে দিলুম। ঘেমে নেয়ে গেছি। হাতে একটা ফোস্কা পড়েছে। কাটারির বাঁট অনেকক্ষণ ধরে রাখার ফলে। জিজ্ঞেস করলুম. 'কি হয়েছে মা ?'

মাকে ওইভাবে বসে পড়তে দেখে অধ্যাপক, লকাবাবু, বিশুদা সকলেই এগিয়ে এসেছে। মা যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, গোকুল বাবা ভোরবেলা দাড়ি কামাতে বসেছিলেন। ঠোঁটের ঠিক পাশেই একটা ব্রণ ছিল। সেই ব্রণটা ক্ষুর লেগে কেটে যায়। সেই সময় বাবা কারোকে কিছু বলেননি। একটু চুন লাগিয়ে সেই অবস্থাতেই চান করতে চলে যান। পুজোপাটও সব সেরেছিলেন। বাজারেও গিয়েছিলেন। এখন ভয়ঙ্কর অবস্থা। গোটামুখ ফুলে গেছে। অসম্ভব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তার ওপর কেঁপে জ্বর।

সন্ন্যাসী মহারাজ স্নান সেরে পুকুর থেকে ফিরছিলেন ! জ্বলজ্বলে ফরসা শরীরে টকটকে লাল ভিজে গেরুয়া। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। প্রথমেই বললেন, 'মৌন ভঙ্গ। তোমরা কথা বলতে পারো। আমি স্নান করতে করতেই বুঝতে পেরেছি, একটা কোনও বিপদ আসছে।'

ছবি বেরিয়ে এসেছে ঠাকুরঘর থেকে। আগের চেয়ে মাথায় অনেক বেড়েছে। ছবি চড়চড় করে লম্বা হচ্ছে। ছবিকে দেখলে মনে হয় আগুনের স্থির শিখা। টকটকে লাল পাড় শাড়ি। ছবি দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হল না, তার কোনও উদ্বেগ আছে। ছবি আজকাল

এইরকমই হয়ে গেছে। সবেতেই আছে ; কিন্তু কোথাও নেই। সব সময় নিজের ভাবে আছে। আমরা সকলেই গোকুলবাবাকে দেখতে ছুটলুম। মহারাজ বললেন, ফকির কোথায় গেল ? ফকিরকে কোথাও পাওয়া গেল না। ঝোলাঝুলি সমেত ফকির উধাও।

গোকুলবাবু বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, পাশে বসে আছেন ফকির। আমরা অবাক। ফকির কখন খবর পেলেন ? মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কখন খবর পেলে ? কে তোমাকে বললে ?'

'কেউ বলেনি। হঠাৎ আমার মনে হল। মনে হল এই দিকে একটা কিছু ঘটছে !'

'তোমার ওই ক্ষমতাটা আমাকে দাও না ফকির।'

'কেন ছলনা করছ মহারাজ ! তোমার আর আমার মাঝে স্বর্গ আর পাতালের ব্যবধান।'

ডাক্তার এসে গেলেন। গোকুলবাবার গোটা মুখটা এমন ফুলেছে যে চোখ দুটো দেখাই যাচ্ছে না। ঢাকা পড়ে গেছে। তেমন জ্বর। আমি পাশে দাঁড়িয়ে, গায়ে একটা গরম তাপ লাগছে ; যেন উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তারবাবু দূর থেকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে পাশের টুলে বসলেন। হাতের ব্যাগটা যেন খসে পড়ল মেঝেতে। ডাক্তারবাবু কি করবেন বুঝতে পারছেন না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। গোকুলবাবা জড়ানো গলায় বললেন, 'দেখুন ডাক্তারবাবু, আমার কি অবস্থা। ভগবানের মার দুনিয়ার বার।'

গোকুলবাবা যন্ত্রণায়, 'উফ্' করে উঠলেন।

চোখে জল এসে গেল আমার। মনে পড়ল সেই কথা। সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিলেন, 'দ্বিতীয়বার তুমি অনাথ হবে।' আমার কোষ্ঠীটা একদিন তাঁকে দেখিয়েছিলুম। প্রথমে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, ওসব বাজে কুসংস্কার। কোষ্ঠীতে কিছু থাকে না। সবই হল, কর্ম আর কর্মফল। অনেক ধরাধরি করায় খুলেছিলেন। বেশ মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। দেখলেন। দেখতে দেখতে বললেন, 'কোষ্ঠী হল পূর্বজন্মের কর্মফল।' আমি আগের জন্মে যা করে এসেছি, এই জন্মে তার ফল ভোগ করব। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'মানুষ জন্মায় ঠিক সেই দিনক্ষণ মুহূর্ত ধরে, যখন সেটা তার প্রাক্তন কর্মফল অনুসারে

গ্রহনক্ষত্রদের সংস্থানের সঙ্গে সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবে একেবারে নির্ভুল ভাবে মিলে যায়। মানুষের কোষ্ঠী হল তার অতীত কর্মের অবিকল প্রতিলিপি যা বদলান যায় না। মানুষের অতীতই হল তার ভবিষ্যৎ।' আমি গতজন্মে খুব খারাপ খারাপ কাজ করে এসেছি। এই জন্মে তার ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। কারোর ক্ষমতা নেই আমাকে বাঁচাতে পারে। গতবার মারা যাবার সময় আমার খুব অনুশোচনা হয়েছিল। বিড়বিড় করে বলেছিলুম, ভগবান, এ আমি কি জীবন কাটিয়ে গেলুম। এই বেদনা নিয়ে মরেছিলুম বলেই, এই জন্মের শুরুতেই আমার সাধুসঙ্গ। সন্ন্যাসী সেদিন আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন—

কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিৎ দাসীপতিরজামিলঃ। কান্যকুব্জ বলে একটা দেশ ছিল। সেই দেশে অজামিল নামে এক লোক ছিল। এই অজামিল এমন পাপ নেই যা করেনি। সমস্ত পাপ—খুন, চুরি, জোচ্চুরি, বাটপাড়ি, সাধুসজ্জনকে অপমান। লম্বা এক পাপের ফিরিস্তি। অজামিল ব্রাহ্মণের ছেলে। জীবনটা বেশ ভালই শুরু করেছিল। ব্রাহ্মণের সমস্ত কাজই সে করত। এক দাসীর পাল্লায় পড়ে তার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেল। সব ছেড়ে সে ওই দাসীর সঙ্গেই থাকত। দেখতে দেখতে তার দশটা ছেলে হল। ছেলেরা দেখতে দেখতে সব বড় হয়ে গেল। তাদের নিয়ে ডাকাতি করে অজামিল। আর থাকে এক বনে, চালাবাড়িতে। অজামিলের ওই জীবন। সে পতিত। দাসীর পতি। আর জীবিকা হল ডাকাতি।

এইবার বেশ একটা মজা হল। সেই সময় এক মুনি ছিলেন—লোমশমুনি। তাঁর একটা অসুখ হল, সর্বাঙ্গে ভীষণ জ্বালা। অসহ্য সেই জ্বালা। সে জ্বালা আর কিছুতেই কমে না। হঠাৎ একদিন নারদের সঙ্গে দেখা। ছুটে গেলেন, 'দেবর্ষিপাদ, আর যে পারি না। সর্বাঙ্গ সর্বক্ষণ জ্বলছে। কে যেন লঙ্কাবাটা মাখিয়ে দিয়েছে। একটা কোনও ওষুধ বলুন দেবর্ষিপাদ।'

নারদ বললেন, 'এর কোনও ওষুধ নেই। তোমার বাপু বৈষ্ণব অপরাধ হয়েছে। তাই তোমার গায়ে এই জ্বালা।'

লোমশমুনি বললেন, 'বলুন কোন বৈষ্ণবের কাছে অপরাধ হয়েছে। গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আসছি।'

নারদ বললেন, 'থাকলে তো চাইবেন ! তিনি তো পরলোকে চলে গেছেন।'

'তাহলে উপায় ! আপনি থাকতে কোনও উপায় হবে না !'

'উপায় নেই, তবে আছেও আবার। কিন্তু সে কি আপনি পারবেন ?'

'কি সেই উপায় !'

'যদি কোনও কর্মচণ্ডালের অন্ন আপনি খেতে পারেন, তাহলে কমতে পারে। জাতি চণ্ডাল নয়। কর্মের ফলে যে চণ্ডাল হয়েছে।'

লোমশমুনি তখন বেরিয়ে পড়লেন। খোঁজ, খোঁজ। কোথায় সেই কর্মচণ্ডাল। কানে এল কান্বকুব্জের সেই অজামিলের কথা। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, কর্মফলে চণ্ডাল। মুনি খুঁজে খুঁজে সেই বনে। অজামিলের কুটীরে গিয়ে পেঁছিলেন। অজামিল তখন ডাকাতি করতে গেছে। ঘরে সেই দাসীটি ছাড়া আর কেউ নেই। মুনির ডাকাডাকিতে বেরিয়ে এল দাসী।

'কি ঠাকুর ! আপনি এখানে ? এখানে তো কোনও মুনি ঋষি আসেন না। এ তো ড়াকাতের জায়গা। কি আশ্চর্য ! তা আপনি এখানে কেন ? পথ ভুলে ?

'না মা। অনেক খুঁজে খুঁজেই এখানে এসেছি, নিজেরই এক প্রয়োজনে। তোমাদের হাঁড়িতে ভাত আছে মা ? আমাকে দুটি দেবে ?'

সেই দাসী তো কিছুতেই দেবে না। অপবিত্র সেই অন্ন। সেই ভাত বনে ছড়িয়ে দিলে পশু পাখীও স্পর্শ করে না। দাসী সেই অন্ন ঋষিকে কেমন করে দেয় ! পাপের ওপর পাপ। মুনি শেষে হাতে পায়ে ধরেন, এমন অবস্থা—'কোনও অপরাধ তোমার হবে না মা। কোনও পাপ হবে না। আমি আজ্ঞা করছি, তুমি আজ্ঞা পালন করো।'

তখন সেই দাসী কি আর করে। বাধ্য হয়েই দুটি ভাত মুনির হাতে দিল। মুনি খেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেহের অসহ্য জ্বালা চলে গেল। কিছু দূরে যাবার পর মুনির মনে হল—আমার তো উপকার হল, ওদের তো কোনও উপকার করে এলুম না। মুনি ফিরলেন।

দাসী বললেন—'কি বাবা ? আবার ফিরলেন কেন ?'

'মা তোমার কটি ছেলে ?'

'দশটি।'

'কোলের ছেলেটির এখনও কোনও নাম রেখেছ কি ?'

'না বাবা।'

'তাহলে ওর নাম রেখ নারায়ণ।'

মুনি খুব কায়দা করে একটা কাজ করে গেলেন। অজামিল ফিরে ফিরে এসে সব শুনল। ডাকাতে হাসি হেসে বললে, 'বেশ তাই হোক, ছেলের নাম রাখো নারায়ণ।'

এইবার শুরু হল অজামিলের খেলা। সে জানতেই পারল না মুনি তার কি উপকার করে গেছেন। সারাদিনে সে অন্তত বার দশেক নারায়ণের নাম করে। ছেলে নারায়ণ। নারায়ণ খেয়েছে ? নারায়ণ শুয়েছে ? নারায়ণ চান করেছে ? দেখতে দেখতে নারায়ণ বড় হল। অজামিল বৃদ্ধ। মৃত্যুকাল উপস্থিত। চোখ বুজিয়ে বিভীষিকা দেখছে। সারি সারি যমদূত। মানুষ ভয় পেলে একজন কারোকে ডাকতে চায়। দশ ছেলের নয় ছেলেরই নাম বিদঘুটে। একমাত্র ছোট ছেলের নামটিই ভারি সুন্দর। নারায়ণ। অজামিল ভয়ে চিৎকার করল —'নারায়ণ আয়।' শোনাল 'নারায়ণায়'। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। নামের এমনই মহিমা। যে যে ভাবেই করুক। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন চারজন বিষ্ণুদূত। যমদূতেরা বললেন—'তোমরা ?'

'অজামিলকে নিতে এসেছি।'

'সে কি ? এর পাপের ফিরিস্তি কত লম্বা জানো ?'

'যত পাপই থাক। নারায়ণকে ডেকেছে যে মৃত্যুর ঠিক আগে।'

'তোমরা মহা ভুল করছ। ও তোমাদের প্রভু নারায়ণকে ডাকেনি। ডেকেছে ছেলে নারায়ণকে।' বিষ্ণুদূত বললেন—এতেনৈব হ্যাযোনোহস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্। যদা নারায়াণেতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥

এতেন এব—এইতেই হবে। পুত্রকে ডাকার ছলে নারায়ণ বলেছে।

সন্ন্যাসী গল্প শেষ করে বললেন,—'গত জন্মে তুমিও ছোটখাট এক অজামিল ছিলে। তোমার কোষ্ঠীই তার প্রমাণ। কিন্তু মরণকালে তোমার অনুশোচনা হয়েছিল। সেই জোরেই তুমি ব্রাহ্মণ! তুমি বসে আছ আমার সামনে। আচ্ছা, এইবার তোমার কোষ্ঠীটা আমি ছিঁড়ে ফালাফালা করি।'

ছিঁড়ে টুকরো করে বললেন, 'কর্মফলের বাইরে আসা যায় বৎস! এই কুসংস্কার, এই ভয় থেকে মুক্তির উপায়—সৃষ্টিকে ছেড়ে স্রষ্টাকে ধরো। জড়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হও। আত্মস্বরূপকে চেনো। যা চিরমুক্ত, অজ, নিত্য, শাশ্বত।'

এবারের পরীক্ষায় আমাকে পাস করতেই হবে। ডাক্তারবাবু ইশারায় আমাদের ডেকে ঘরের বাইরে এলেন। এসে বললেন—'কোনও আশা নেই। ইরিসিপ্লাস হয়ে গেছে।'

॥ চৌদ্দ ॥

ছবি ডাক্তারবাবুর হাত চেপে ধরে বললে, 'ইরিসিপ্লাস হলে কি হয়?'

'কিছু করার থাকে না মা।'

'তার মানে মৃত্যু?'

ডাক্তারবাবু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'খুব বড় ডাক্তার ডাকলে কেমন হয়! ভাল হবার সম্ভাবনা আছে?'

'সান্ত্বনা, এ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাকে খুব একটা হাতুড়ে ভাববেন না।'

'আপনি কথাটা ওভাবে নেবেন না। এইরকম অবস্থায় মানুষ এইরকমই বলে।'

'ব্যাপারটা আপনাদের বুঝিয়ে দি। এই অসুখটার নাম ইরিসিপেলাস। স্কিনে ইনফেকশান। চামড়ার ক্ষতে রোগ জীবাণুর সংক্রমণ। জীবাণুর নাম হেমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস। যে কোনও ক্ষতের ভিতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। কাটা-ছেঁড়া দিয়েই ঢোকে। ঢুকেই ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। ভীষণ সংক্রামক। যাঁরা সেবা করবেন তাঁদেরও খুব সাবধানে থাকতে হবে। হাত-পা-কাপড় জামা ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে। দেখবেন, দেখতে দেখতে সারা শরীর ফুলে লাল হয়ে যাবে। এর কোনও চিকিৎসা নেই। ভগবানই ভরসা। বিলেতে অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। এ-দেশে এখনও আসেনি। আপনারা সবাই রয়েছেন, ভগবানের নাম শোনান। তবে সাবধান, বেশি কাছে যাবেন না। রোগীর জিনিসপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। সে কাজ যে কোনও একজনে করুন। ছোটদের দূরে রাখুন। এই আর কি। আমি আসি। আমার ভিজিট আর দিতে হবে না। নো প্রেসক্রিপশান, নো ভিজিট। অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি।'

ডাক্তারবাবু গটগট করে চলে গেলেন। ফকির বললেন, 'কি সব বলে গেলেন গড়গড় করে। মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না।'

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'এইবার দেখাও তোমার কেরামতি। মানুষ হাল ছেড়ে দিলে দৈবই ভরসা।'

ফকির গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমি দেখে নিয়েছি মহারাজ। আগেই দেখে নিয়েছি। দম যে ফুরিয়ে গেছে। এ ঘড়ির আর কিছু করা যাবে না। জীবনের পেণ্ডুলাম যখন থামবে তখন থামবেই। দম থাকলে কিছু করা যেত।'

মা দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। তিনি বললেন, 'এই যে শুনি আপনার অনেক ক্ষমতা। মরা মানুষ জ্যান্ত করেন!'

'মরা মানুষ জ্যান্ত করতে পারলে আমি এইখানে না থেকে চলে যেতুম ওইখানে। খোদার ওপর খোদগারি চলে না মা। আমি টুকটাক মেরামতের কাজ চেষ্টা করে দেখি। খোদার কারখানার আমি এক মিস্ত্রি। তিনিই হলেন ইঞ্জিনিয়ার।'

মা হঠাৎ রাগে জ্বলে উঠলেন। ফর্সা মুখ লাল টকটকে হয়ে গেল। বললেন, 'এতখানি সব শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছে না। বুজরুকের দল। সারাদিন মাতন লাগিয়ে ঘোরা আর বড় বড় কথা বলা। লোক ঠকিয়ে সারা জীবন ঘুরে বেড়ান। আমি সব ভেঙে চুরমার করে দোবো। ধর্ম, ধর্ম, ধর্ম। সব আমি আগুন লাগিয়ে দোবো।' মা তীরবেগে ঘরে ঢুকে গেলেন। দেয়ালে ঝোলানো ছিল নারায়ণের ছবি। ছবিটা এক ঝটকায় খুলে, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে। ফকির আর সন্ন্যাসী মহারাজের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কাচটা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। একটা টুকরো ছিটকে লাগল ফকিরের পায়ে। পা কেটে গেল। রক্তের ধারা নেমে আসছে। ফকিরের গ্রাহ্য নেই। তিনি নিচু হয়ে ছবিটা তুলতে গেলেন। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল একটা তামার ঘট। গিয়ে পড়ল বাইরের জমিতে। একটুর জন্যে ফকিরের মাথা বেঁচে গেল। মা ছুঁড়ছেন। ঘরে ঠাকুর-দেবতার যা কিছু ছিল সব একে একে ছুটে আসছে বাইরে। আর না। সন্ন্যাসী মহারাজের বুকে এসে পড়ল মাকালীর ছবি। তিনি লুফে নিলেন।

আমি ঘরে লাফিয়ে পড়লুম। মায়ের ছোঁড়া পাথরের একটা সিঁদুর-কৌটো কপালে এসে লাগল। মাথাটা চন্ করে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যে চোখে নেমে এল অন্ধকার। সামলে নিলুম কোনওক্রমে। কপালটা থেঁতো হয়ে গেছে। কৌটোর ঢাকনা খুলে সারা গায়ে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ খুলেই দেখি শালগ্রাম সমেত নারায়ণের সিংহাসন ছোঁড়ার জন্যে মা তৈরি হচ্ছেন। ঝাঁপিয়ে পড়লুম মায়ের বুকে। দু'

হাতে জড়িয়ে ধরলুম। মা পাগল হয়ে গেছেন। মুখ চোখ অন্যরকম হয়ে গেছে। গায়ে যেন অসুরের শক্তি। কিছুতেই যেন চেপে ধরে রাখতে পারি না। ছবিও ছুটে এসেছে। দু'জনে দু'পাশ থেকে চেপে ধরলুম মাকে। মায়ের হাতও কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে ঝুঁঝিয়ে।

ছবি বললে, 'মা তুমি শান্ত হও মা। মা তুমি শান্ত হও। ভগবানের ওপর রাগ কোরো না।'

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তুই আমাকে ছুঁবি না। অপয়া অলুক্ষুণে। নিজের বাপ-মাকে খেয়ে, যবে থেকে এ বাড়িতে এসে ঢুকেছে তবে থেকে একটা না একটা বিপদ। একটা না একটা বিপদ। নিকালো, আভি নিকালো।'

বলতে বলতেই মায়ের শরীর অবসন্ন হয়ে এল। মায়ের জ্ঞান চলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বসে পড়ছেন। আমরা দু'জনে মিলে মাকে শুইয়ে দিলুম মেঝেতে। ছবি বাতাস করতে করতে বললে, 'জল নিয়ে এসো। মা যা বলেছে, তার জন্যে রাগ কোরো না। মায়ের মাথার ঠিক নেই।'

ছবিকে বলতে হবে কেন, আমি কিছুই মনে করিনি। মা যা বলেছেন, সব সত্য। আমি নিজেই তো জানি, ভীষণ অপয়া আমি। আমাকে যে ভালবাসবে, সে মরে যাবে। আমাকে ঘেন্না করে মা বরং বেঁচে থাক। লকাবাবু আর বিশুদা মায়ের ছুঁড়ে ফেলা সমস্ত জিনিস একটা একটা করে তুলে যেখানে ছিল সেইখানেই সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছেন। অধ্যাপক একটা ঝ্যাটা খুঁজে এনে কাচ পরিষ্কার করছেন। সন্ন্যাসী মহারাজ মায়ের মাথার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে মাথায় হাত রেখে জপ করছেন। গোটা সংসারটা এক মুহূর্তেই যেন তছনছ হয়ে যেতে বসেছে।

আবার ভাঙল। গামছা ভিজিয়ে মায়ের মুখে মোছাতে মোছাতে আমার ভীষণ হাসি পেল। হাসিতে ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠছে। ছবি বাতাস করতে করতে বললে, 'কাঁদছ, না হাসছ?'

'হাসছি।'

'হাসছ কেন? এ তো আমাদের কাঁদার সময়।'

'আমি প্রথমে কাঁদছিলুম; এখন আমি হাসছি। এই বলে হাসছি, ভগবান, সকলেরই তুমি কত কিছু ভাল করো। আমার সবই খারাপ।

আমার মতো ছেলের বাবা থাকে, মা থাকে, বাড়ি ভর্তি কত আত্মীয়-স্বজন থাকে। তারা স্কুলে যায়, লেখাপড়া করে। কত আদর পায়। আর আমার! যাও-বা বাবা, মা পেলুম, তোমার মতো বোন পেলুম, কোথা থেকে এক সাধু এসে সব গোলমাল করে দিয়ে গেলেন। তুমি একেবারে অন্যরকম হয়ে গেলে। আর আমাদের বাবার ওই তো অবস্থা, মা পড়ে আছেন মেঝেতে। আগে ভগবানের কাছে কত কি চাইতুম, এখন চাইছি, দাও কত দুঃখ দেবে দাও। একেবারে পথে বসিয়ে দাও। সব ছারখার করে দাও আমার।'

ভিজে গামছা আর পাখার বাতাস আর সন্ন্যাসী মহারাজের জপে মা চোখ মেলে তাকালেন। তাকাতেই আমি ছবির আড়ালে মুখ লুকোলুম। আমাকে দেখলেই মা আবার জ্বলে উঠবেন। মা উঠে বসলেন। আমি বসে বসেই পালাতে চাইলুম। মা আমার হাত ধরে বুকে টেনে নিলেন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'তোমার ছেলে। দেখে রেখো, এই তোমাকে বুক দিয়ে আগলাবে।'

মা আমাকে ছেড়ে সন্ন্যাসী মহারাজকে প্রণাম করতে করতে বললেন, 'তিনি কি আছেন? সেই ভগবান!'

'আছেন মা। না থাকলে, যুগ যুগ ধরে মানুষ কেন তাঁকে খোঁজে। যা নেই তা কি কেউ খোঁজে! যা আছে তাকেই আমরা খুঁজি। আলো আছে বলেই মানুষ অন্ধকারে আলো খোঁজে।'

'মহারাজ, আমার যে পাপ হল। সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।'

'মন থেকে তো ফেলতে পারোনি মা। কেউ পারে না মা। ঘোরতর নাস্তিকও তাঁকে ফেলতে পারে না। যা আছে তাকেই মানুষ অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যা নেই তা তো নেই-ই। তাকে নিয়ে মানুষের মাথা-ব্যথার কোনও কারণ নেই। আছেকেই মানুষ নেই করতে চায়। হাঁ বলেই না। বৃহৎ ক্ষুদ্রকে গ্রাস করতে চায় বলেই ক্ষুদ্রের যত বিদ্রোহ। মায়ের কোলে শুয়েই শিশুর লাথি ছোঁড়া। মা যে জোর করে দুধ খাওয়াতে চায়।'

মা ফকিরের সামনে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন, 'বাবা, আমি আপনাকে মেরেছি।'

ফকির দু'হাত মাথার ওপর তুলে নাচতে নাচতে বললেন, 'সেই তো

আমার মায়ের আশীর্বাদ। মা কি মারেন, না মারতে পারেন।'

'পায়ের ওই জায়গাটায় একটু কিছু লাগিয়ে দি।'

'কোন্ জায়গাটায় মা! আমার তো কোথাও কিছু হয়নি।'

আমরা সকলেই অবাক হয়ে দেখলুম, ফকিরের পায়ে কোথাও কোনও কাটাকুটি নেই। অথচ একটু আগেই কাঁচের টুকরো লেগে ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছিল। ফকির যে কত কি জানেন? কিন্তু এক জায়গায় একেবারে অসহায়। মানুষের দম ফুরিয়ে গেলে আর কিছুই করতে পারেন না।

সন্ধে হয়ে এল। গোকুলবাবার একপাশে মা, একপাশে আমি, মাথার দিকে ছবি। বাইরের রকে বসে আছেন ওঁরা সবাই। সকলেরই উপবাস। সন্ন্যাসী মহারাজ সেই যে জপে বসেছেন একেবারে অচল, অটল হয়ে আছেন। বিশুদার মতো ছটফটে মানুষ, তিনিও একেবারে স্থির। ফকিরবাবা বসে আছেন পর্বতের মতো। সবাই বসে আছেন যেন কারোর আসার কথা আছে। গাড়ি নিয়ে কেউ আসবেন। সে কে? মৃত্যু? বাবাকে নিতে আসবেন! গোকুলবাবার অমন সুন্দর মুখ, এমন ফুলেছে যে নাকটা কোনওরকমে জেগে আছে। জাহাজের মাস্তুলের মতো। শরীরের রক্তে রোগের বীজ বাড়ছে, ক্রমশই বাড়ছে। খুবই যন্ত্রণা, এখন তার আর কোনও প্রকাশ নেই। বুকের ওপর তাঁর নিত্য সঙ্গী জপের মালাটা রাখা হয়েছে। এরই মাঝে, ছবি যখন একবার বাইরে গিয়েছিল, আমি বিছানার পাশ থেকে উঠে গিয়ে তাকে ধরেছিলুম—'তোমার এত শক্তি, তুমি বাবাকে ভাল করে দাও না ছবি। আমার যে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাবো, কার কাছে থাকবো! সাধুবাবার দিয়ে যাওয়া সেই শক্তিকে তুমি একবার বের করো। তোমার কষ্ট হচ্ছে না? তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কি যন্ত্রণা!'

ছবি আমার হাত চেপে ধরে বললে, 'একদিন আমি বলেছিলুম, সব উড়ে পুড়ে যাবে! এ তো আমি জানতুম। আমি দেখেছি। আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি। যা যা ঘটবে সব আমার জানা। কিছুই করার নেই, দেখা ছাড়া। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ দুঃখ। সবই ভিতরে। সাধুবাবা আমাকে বলেছিলেন, সহ্য করার নামই সাধনা।'

উপমাটা হল, দিন যখন রাত হয় কারোর ক্ষমতা নেই তাকে আবার দিন করার। দিনের আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ে রাতের মতো হয়ে এলে, বাতাস চেষ্টা করে করে দেখতে পারে। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে মেঘ। আবার তাও না পারে। মেঘে মেঘে বেলা চলে গিয়ে রাত এসে যেতে পারে। ইচ্ছা-শক্তিও তাঁর শক্তি। মানুষকে নিয়ে তিনি খেলা করেন। মহাকাল, মহাকাল, কাল, আর মহাকাল, এই শুনে আসছি চিরটা কাল। সেই দেখেছিলুম একটা ঘটনা যখন ঘটে, তখন মানুষ শুধুই দেখে, দেখতেই থাকে। ট্রেনের জানালায় বসে আমরা যেমন চলন্ত দৃশ্য দেখি। মনে কত কি চিন্তা, আসছে আর চলে যাচ্ছে। সময় সময় মনে হচ্ছে, আমি বুঝি পাথরের মানুষ। মূর্তির মতো বসে আছি। অদ্ভুত সব উপমা আসছে মনে, গোকুলবাবার দেহটা যেন ঘাট আর ভেতরের জীবনটা এক নৌকো। সেই নৌকো ঘাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বসে আছি ঘাটের পাশে। শুনতে পাচ্ছি, দাঁড় ফেলার শব্দ। ঘাটে বসে মানুষ যেমন দেখে—নৌকোটা তীর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দূরে, আরও দূরে। এক সময় আর দেখা যাবে না। পড়ে থাকবে শূন্য ঘাট। ঢেউ ভাঙার ছলাত ছলাত শব্দ।

গোকুলবাবার কপালটাই কেবল ফোলেনি। ছবির ডান হাত সেই কপালে। মায়ের হাত বাবার বুকে। জপের মালার ওপরে। আমার হাত বাবার হাতে। সবাই চেষ্টা করছি বাইরে থেকে ধরে রাখার টেনে রাখার। ভেতর থেকে যা চলে যায় বাইরে থেকে তাকে কেমন করে ধরে রাখা যায়!

গোকুলবাবা একসময় ইশারায় আমার কানটা তাঁর ঠোঁটের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। ঠোঁট ফাঁক করতে পারছেন না। কোনওরকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—'শোনো যা বাকি রইল তুমি করবে। আমার জীবনের শেষটা তোমাকে দিয়ে গেলুম। হিসেবের খাতায় দেনা-পাওনা যা রইল সব তোমার। সাবধানে আলো জেবলে পথ চলবে। কথার চেয়ে কাজ বড়ো। জ্ঞানের চেয়ে উদাহরণ বড়। ইচ্ছা সবার চেয়ে বড়। মানুষ যায়, আমার এইভাবে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কি আর করা যাবে। যার যে ভাবে টিকিট কাটা থাকে! কর্মফলের টিকিট।'

।। পনেরো ।।

ঘাসের ওপর দিয়ে সাপ চলে যাবার মতো রাত চলে যাচ্ছে। বিছানায় গোকুলবাবা স্থির হয়ে শুয়ে আছেন। যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু কোনও প্রকাশ নেই। একটু আগে সন্ন্যাসী মহারাজ এসেছিলেন। হাতে পুজোর ফুল। মাথায় রেখে বললেন, 'যেতে যখন হবেই বীরের মতো যাও। মনে মনে হাসতে হাসতে যাও। নাম করতে করতে যাও। মনে অবিশ্বাস এনো না। সব তাঁরই ইচ্ছা। কেন হল এমন, কি জন্যে হল, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে নেই। চোখের সামনে তাঁকে রাখো।'

গোকুলবাবা হঠাৎ উঠে বসলেন। কোনও রকমে বললেন, 'জীবনের শেষ পুজোটা করে যাই।'

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'খুব ভাল কথা।'

মা বললেন, 'তুমি পারবে না। ওগো তুমি পারবে না।'

গোকুলবাবা বললেন, 'দ্যাখোই না। তোমার সেই লাল পাড় শাড়িটা পরে এসো। তুমি বসবে আমার সঙ্গে। পরের বার যদি আবার আসি, তোমার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।'

মায়ের টানাটানা চোখ দুটো উপচে কুলকুল করে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি উঠে গেলেন। ঠাকুরঘরে বিশালভাবে পুজোর আয়োজন হল। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, সাদা ফুল। যত আলো ছিল সব জেবলে দেওয়া হল। গোকুলবাবা তাঁর সব চেয়ে ভাল গরদের কাপড়টা কোনওরকমে জড়িয়ে আসনে সোজা হয়ে বসলেন। সামনে পেতলের থালায় জপের মালা।

ঠাকুর-ঘরের বাইরে আমরা সবাই বসে আছি। একজন মানুষের জীবনের শেষ পুজো দেখছি। ঠাকুর-ঘরের ভেতরে বসেছেন সন্ন্যাসী মহারাজ আর ফকিরবাবা। গোকুলবাবা আর মা বসে আছেন পাশাপাশি আসনে। মায়ের আজ কি পরীক্ষা! পেছন দিক থেকে গোকুলবাবাকে দেখে মনেই হচ্ছে না, তিনি অসুস্থ। হয়তো একটু পরেই চলে যাবেন চিরকালের জন্যে। মনে হচ্ছে, রোজ যেমন পুজোয় বসেন সেই ভাবেই বসে আছেন পিঠ টান করে।

সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন, 'গোকুল, তুমি তোমার মন্ত্র স্ত্রীকে দান করে দাও।'

গোকুলবাবা কিছু ফুল মায়ের দু'হাতের অঞ্জলিতে দিয়ে কানে কানে কি বললেন. মায়ের শরীর দুলে উঠল। কিছু ফুল মায়ের মাথায় দিলেন। মা স্হির। নড়াচড়া কিছুই নেই। বাতাস বইছে, তবু সব কটা প্রদীপের শিখা স্হির। ধূপের ধোঁয়া মহাদেবের পিঙ্গল জটার মতো পাক খাচ্ছে। সিংহাসনে হাসছেন বিষ্ণুর মূর্তি। একপাশে বসে আছে ছবি পাথরের মূর্তির মতো। সন্ন্যাসী মহারাজের শরীর ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আলোর মানুষ। ফকিরবাবা ধ্যানে ডুবে আছেন। কি জানি এখুনি হয়তো ভেসে উঠবেন শূন্যে।

সন্ন্যাসী মহারাজ হঠাৎ বললেন. 'গোকুল, তোমার আজ দর্শন হবে।'

গোকুলবাবা নারায়ণের পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছেন। একবার, দু'বার, তিনবার, বহুবার। ফুলের পাহাড় হয়ে গেল। দিচ্ছেন তো দিচ্ছেনই। এক হাতে ঘণ্টা আর এক হাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করলেন কিছুক্ষণ। বাইরের পুজো যেভাবে করে সবই করলেন, বাকি রইল না কিছু। প্রথমে দেহ একটু বাধা দিচ্ছিল, ক্রমে সে বাধা সরে গেল। স্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। মাকে বলছেন ঃ 'অঞ্জলি দাও। মন্ত্র পড়ো জোরে জোরে, সব কেঁপে উঠুক।'

অধ্যাপক আমার পাশটিতে বসেছিলেন। শান্ত মানুষ। তিনি মাঝে মাঝে রুমালে চোখ মুছছেন। আমার ভেতরটা একেবারে গুমোট হয়ে গেছে। কিছুই আর ভাবতে পারছি না। চোখের সামনে দিয়ে মিছিল করে সব ঘটনা চলে যাচ্ছে। একটু আগে থালা ভর্তি ফুল ছিল। সেইসব ফুল এখন নারায়ণের পায়ে। একটু আগে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছিল, নিবে গেছে, জ্বলে জ্বলে। কর্পূরদান পুড়ে কালো হয়ে গেছে। গোকুলবাবা নিঃশব্দে জপ করে চলেছেন। মালা ঘুরছে। এমনও কি হয় না নারায়ণের দয়া। চারটি হাতের একটি হাত তুলে বাবাকে আশীর্বাদ করলেন,'যাও, তোমার সব সেরে গেল।' গোকুলবাবা বেঁচে রইলেন আরও অনেক বছর। আমি বড় হব। চাকরি করব, কি আর কিছু করব। ছবি হয় সন্ন্যাসিনী হবে, না হয় বিয়ে করবে। মা বুড়ি হবেন। তখন না হয় যাবেন। সব কাজ শেষ হলে, তবেই তো

ছুটি হয়। কাজ ফেলে কেন চলে যাবেন? সবই তো বাকি। ভগবানকে যে এত ভালবাসে, ভগবান তাকে এইটুকু করে দিতে পারেন না! ভগবানের বিচার বলে কি কিছুই নেই! কোথায় গেল ফকিরের শক্তি, সন্ন্যাসীর তেজ? আজ তো এই হল, কাল কি হবে! কাল বাদ পরশু। ভগবানকে আমি চিনি না, তিনি যেই হোন, সেই শৈশব থেকেই আমাকে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে আসছেন। একটার পর একটা।

হঠাৎ জপ বন্ধ করে গোকুলবাবা বললেন, 'যাও, লালপাড় শাড়ি ছেড়ে, সরু কালপাড় সাদা শাড়ি পরে এস।' মা হতবাক্ হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফকিরবাবা সেই কথা শুনে ধ্যানস্থ অবস্থাতেই কেঁপে উঠলেন! সন্ন্যাসী মহারাজের মুখে খেলে গেল মৃদু হাসি।

মাকে ইতস্তত করতে দেখে, বাবা বললেন, 'যাও দেরি কোরো না। পথ ফুরিয়ে আসছে, আমি শেষ দেখতে পাচ্ছি।'

আঁচলে মুখ ঢেকে মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'আমি পারবো না। আমি পারবো না।'

'তোমাকে পারতেই হবে। তোমার নতুন রূপে সাজিয়ে দিয়ে আমি যাবো। দেরি কোরো না, আমি আমার যাবার ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি।'

মা সন্ন্যাসীর দিকে তাকালেন। দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। ভেবেছিলেন মহারাজ হয়তো, না বলবেন। মহারাজ বললেন, 'যাও মা। স্বামী তোমার গুরু। এ যে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন মা!'

মা উঠে গেলেন। ফিরে এলেন সাদা একটা ধুতি পরে। কিন্তু কি সুন্দর দেখাচ্ছে। এ যেন আর এক রূপ। বাবা জপের মালাটি মায়ের হাতে দিলেন। বললেন, 'নোয়া আর শাঁখাটি খুলে রেখে দাও নারায়ণের বেদিতে।'

'আমি আর পারব না। ওগো আমি সত্যিই পারবো না। তুমি তো এখনও রয়েছো।'

'আর মাত্র পনের মিনিট। খোলো, খুলে ফেল।'

এ-গলা আমার গোকুলবাবার স্বাভাবিক সেই সুরেলা গলা নয়। অনেক ভারি, জড়ানো।

মা মাথা নিচু করে হাতে শাঁখা আর নোয়া খুলে নারায়ণের বেদিতে রাখলেন। আমার তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না যে গোকুলবাবা সত্যিই চলে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছিল, বেশ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল এত কাণ্ডের পরও যদি মৃত্যু না হয়, তাহলে ব্যাপারটা খুবই লজ্জার হবে। কি আশ্চর্য মন আমার। এই একটু আগে কান্নায় বুক ফেটে যাবার মতো হচ্ছিল, এখন হচ্ছে কৌতূহল। মৃত্যু হোক তা আমি চাই না, এখন মনে হচ্ছে না হলে বাবা এত লোকের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। মৃত্যু নিয়ে এইভাবে কেউ খেলা করে!

গোকুলবাবা গঙ্গার জল আঙুলে নিয়ে মায়ের মাথার সিঁদুর মুছিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মায়ের মাথার দিকে। জলে ভাসা চোখ। মায়ের ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আরও, আরও, কত, কত বছরের কথা ছিল বলার. গল্প ছিল, গান ছিল। কত তীর্থে যাবার ছিল। সংসারের কত হিসাব নিকাশ ছিল। শেষ হতে এখনও কত বছর বাকি ছিল!

গোকুলবাবা হঠাৎ নারায়ণের দিকে দু'হাত তুলে বললেন, 'আমি তাহলে আসি এইবার। আসি আমি। ভগবান আপনি রইলেন।' পেছন ফিরে আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তবে এইবার যাই।' সন্ন্যাসী মহারাজের সামনে মাথা নিচু করলেন। মুখটা এত সাংঘাতিক ফুলেছে যে তাকানো যায় না। আয়নায় নিজের মুখ দেখলে নিজেই ভয় পেয়ে যেতেন। মহারাজ মাথার পিছন দিকে দু'হাত রেখে কিছুক্ষণ বসে রইলেন স্থির হয়ে। কিছুই বললেন না। কেবল গোকুলবাবাকে দেখে মনে হল, শরীরে একটা কিছু প্রবেশ করছে। বেশ আরাম পাচ্ছেন। সব যন্ত্রণা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। এত সব শক্তি, কিন্তু একটা ব্যাপারে কত অসহায়! মৃত্যুকে বলতে পারছেন না, তুমি যাও, তুমি এস না। আসতে হয় আর পঞ্চাশ বছর পরে এসো।

গোকুলবাবা ধীরে ধীরে মহারাজের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস পড়ল ফোঁস করে। আরামের নিঃশ্বাস। মহারাজ তাঁর দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে স্থির হলেন। মুখে অদ্ভুত এক জ্যোতি। তিনি তিনবার মৃদু গলায় বললেন, নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ। সব শেষ।

আমি আর একবার পথে বসলাম। ভগবানের কি অসীম কৃপা! সেই সাধুবাবা আমাকে বলেই গিয়েছিলেন, 'তুমি একভাবে কখনও স্থির হয়ে বসতে পারবে না। তোমার হল মাছির বরাত। একবার এখানে, একবার ওখানে। তোমাকে কেবলই উড়ে বেড়াতে হবে।' ঠিক আছে, তাই তবে হোক।

সন্ন্যাসী মহারাজ হাত নামিয়ে বললেন, 'মহাসাধকের মতো চলে গেল। আর একবার মাত্র আসতে হবে। সেইটাই হবে শেষজন্ম। যাও, তোমরা সব যাও। সব ব্যবস্থা করো। ফুল আন। খাট আন। মালা আন।'

অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হল গোকুলবাবার দেহে। সমস্ত ফোলা চলে গেল। মুখটা স্বাভাবিক হয়ে একেবারে দেবতার মতো হয়ে গেল। সেই খাড়া টিকলো নাক। ধারালো মুখ। পদ্মফুলের মতো গায়ের রঙ। কোথা থেকে একটা জ্যোতি এসে গেল সারা দেহে। মনে হচ্ছে সাধুবাবার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন যীশুখ্রীস্ট।

ছবি আলতার শিশি আর কাগজ নিয়ে এল। বিশুদা এগিয়ে এলেন। পায়ের ছাপ তোলা হল। মায়ের চোখে একফোঁটা জল নেই। ছবির চোখে একফোঁটা জল নেই। সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে। এদের এমনই শিক্ষা। অন্য কেউ হলে হাঁউমাউ করে কাঁদত। গোটা পাড়ার লোকজন ছুটে আসত। আমি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম। মনের মধ্যে যত জোর আছে সব একজায়গায় করে বলতে লাগলুম মনে মনে, বাবা, তুমি উঠে বোসো, তুমি কথা বলো। এত সুন্দর শরীরটা পুড়ে যাবে। পৃথিবীতে যা হবার নয় তা হবার নয়। ফকিরবাবা উঠে গেছেন। মনে হচ্ছে লজ্জায়। কিছু তো করতে পারলেন না। কেবল একটি কথাই বললেন, 'খোদার ওপর খোদকারি চলে না।'

অনেক ধূপ জ্বালা হল। শুরু হল রাম নাম। ওদিকে খাট এসে গেল। এল ফুল। তার মধ্যে পদ্মও আছে। চন্দন ঘষে মা নিজের হাতে ফোঁটা দিয়ে বাবাকে সাজিয়ে দিলেন। চিরযাত্রার জন্যে গোকুলবাবা প্রস্তুত। কথা উঠল, কে মুখাগ্নি করবে! ঠিক হল, আমি করব। আমাকেই তিনি ছেলে হিসেবে নিয়েছিলেন।

রাত বারোটা। চারপাশ নিষুতি। ফটফটে চাঁদের আলো। সেই

লক্ষ্মী প্যাঁচাটা বসে আছে ছাতের আলসেতে। দেখছে, সংসার ভেঙে দিয়ে একটা মানুষ কেমন চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছেন। দু'দিন আগেও যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাকে গাছতলায় ব'সে বলেছিলেন, 'অধ্যাপক যখন এসে গেছেন, তখন আমি সব ছেড়ে লেগে পড়ব আশ্রমের স্কুলটার জন্যে। একেবারে শান্তিনিকেতনের কায়দায় হবে, খোলামেলা।' বলেছিলেন, এই শীতে বাড়িটা রঙ আর সামান্য মেরামতের কাজে হাত দেবেন। আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি যেভাবে জীবন কাটাচ্ছ, ওভাবে কিছু হবে না। ভাল ক'রে লেখাপড়া কর। লেখাপড়া করেও সন্ন্যাসী হওয়া যায়। সন্ন্যাসী হয় মনে। মনে যে সন্ন্যাসী, সেই ঠিক সন্ন্যাসী। সাধুসঙ্গ ভাগ্যের কথা ; কিন্তু দেখো, মূর্খ করে রেখো না নিজেকে। সবাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পারে না। তখন বিপদে পড়ে যাবে। সংসারের কথা মাথায় রেখে এগোও, সন্ন্যাসী যদি হতে পারো, সে তো ভালই। সে তো মহাভাগ্যের, কিন্তু ভীষণ কঠিন পথ।' স্নান করতে যাবার আগে কত কথাই হল। এই তো সেদিন। সব কথা শেষ, সব কাজ শেষ। আমার দেখা একটা শ্রেষ্ঠ মানুষ, কেমন চলে যাচ্ছেন! দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, কিভাবে মরতে হয়! সন্ন্যাসীরাও হতভম্ব হয়ে গেছেন। আমিও এইভাবেই মরতে চাই। পরপর এতগুলো মৃত্যু দেখে, মৃত্যুকেই ভালবেসে ফেলেছি। জীবন বড় এলোমেলো, মৃত্যু কেমন সুন্দর, গোছানো। ঝেড়ে ঝুড়ে, পাট করে তুলে রাখা কাপড়ের মতো। সেইদিনই বাবা বলছিলেন, 'এইবার তোমার পইতেটা দিতে হবে। পইতে হল ব্রাহ্মণের দ্বিজন্ম। যে কারণে ব্রাহ্মণকে বলে দ্বিজ।'

'বল হরি'—গম্ভীর ধ্বনি। বিশুদা বললেন, 'চলুন, আমরা এগিয়ে পড়ি। আর রাত করা ঠিক হবে না।' সবাই খাট তুলে নিলেন কাঁধে। গোকুলবাবার রাজবেশ। ফুলের মধ্যে পদ্মের মতো ফুল ফুটে আছে তাঁর মুখে। যেন হাসছেন। কত বড় একটা কাজ করে ফেলেছেন! সব ছেড়ে কেমন চলেছেন! একবারও ফিরে তাকালেন না, তাঁর বাড়ির দিকে। উঠনের দিকে। বাঁধানো বকুলতলার দিকে। কাঠের যে চৌকিটার ওপর বসে মাঝে মধ্যে তেল মাখতেন, আর আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, সেই চৌকিটা ফটফটে চাঁদের আলোয় পড়ে আছে। একপাশের তারে গোকুলবাবার সাদা গামছাটা বাতাসে

উড়ছে। বকুলতলায় মা দাঁড়িয়ে আছেন। একপাশে সন্ন্যাসী মহারাজ। গোকুলবাবা না দেখুন, আমি ফিরে ফিরে সব দেখছিলুম। কাল সকালে আমরা সবাই ফিরে আসব, একজন ছাড়া। ফিরে এসে দেখব, গোকুলবাবার ব্যবহার করা সব জিনিস সাজানো রয়েছে। দরজার পাশে চটি, যে চটি আর কোনওদিন সেই পা দুটো পাবে না। পাট করা ধুতি পাঞ্জাবি সেই শরীর আর পাবে না। সারি সারি বই সেই দুটো চোখের দৃষ্টি পাবে না। বিছানার বালিশ সেই জ্ঞানে-ভরা মাথা পাবে না। ঠাকুর-ঘরের ঘণ্টা ধরবে না সেই হাত। ভোরবেলা কেউ আর শুনতে পাবে না সেই অপূর্ব নামগান। নেই তো নেইই। এমন একটা না লেখা হয়ে গেল আমি না মরা পর্যন্ত সেই না আর হ্যাঁ হবে না। আমিও যেদিন ওপরে যেতে পারবো স্বর্গে, সেইদিন হয়তো দেখবো, যাঁরা আগে এসে গেছেন, তাঁরা সব বসে আছেন। আমাকে দেখে হই হই করে উঠবেন, এসো, এসো, বলো পৃথিবীর কি খবর। সবাই কে কেমন আছে! হ্যাঁ রে, রথের মেলা থেকে যে-লেবু গাছটা এনে বাগানে বসিয়েছিলুম, তাতে ফল হচ্ছে? গামছাটা তারে ঝুলছিল, তুলে রেখে আসিনি, সেটা তোর মা তুলেছিল তো! না কালবৈশাখীতে উড়ে গেল। আমার হাতঘড়িটায় রোজ দম দেওয়া হয় তো? তেল মাখার বাটিটা বকুলতলায় ছিল, কাকে নিয়ে যায়নি তো? জলচৌকিটা তুলে রেখেছিস ঘরে? সন্তোষের দোকানে দু'টো টাকা বাকি ছিল, দিয়ে দিয়েছিস তো? হ্যাঁ রে, গঙ্গার ঘাটটা মেরামত করেছে! বকুলগাছে এখনও ফুল হয়! নিত্য নারায়ণ-পুজো কে করছে?

'হরি রাম, হরি নারায়ণ।' আমরা এগিয়ে চলেছি। ফকিরবাবাও কাঁধ দিয়েছেন। ছবি আমার পাশে পাশে হাঁটছে। মাঝে মাঝে তার হাত আমার হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমরা সিদ্ধেশ্বরীতলা, শীতলাতল ছাড়িয়ে এলুম। কেউ কোথাও নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে ল্যাম্পপোস্ট, জেগে আছে চাঁদ। তারাদের পরিচিত মুখ অনন্তকাল ধরে যারা তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। কে গোকুলবাবাকে ভগবান ডেকে নিলেন, বুঝতে পারছি। ছবির জন্যে ছবিকে যে মহাসাধিকা করবেন তিনি। এরপর হয়তো মাকেও তিনি টেনে নেবেন। নিলেই হল। তিনিই তো সব।

আমরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছি না। শুধু হাঁটছি আর হাঁটছি। গোকুলবাবার দেহ যেন শূন্যে ভেসে চলেছে ফুল হয়ে। গোছা গোছা ধূপ জ্বলছে। মাঝে মাঝে সেই গন্ধ আর ফুলের গন্ধ নাকে আসছে। বেশ বুঝতে পারছি, লকবাবুর কষ্ট হচ্ছে, তাও তিনিও কাঁধ ছাড়ছেন না। সেই লকাবাবু, যিনি মানুষের কোনও উপকারেই লাগতেন না, তিনি আজ কাঁধ দিচ্ছেন। ভগবান সব পারেন। নিতে পারেন, দিতে পারেন।

আমরা শ্মশানে এসে গেলুম। সামনে কুলকুলু গঙ্গা। শ্মশানে ঢোকার দু'পাশে বড় বড় গাছ। গাছের পাতায় বাতাসের সিমসিম শব্দ। অশরীরীরা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। বলছে —কে এল, কে এল! বাঁধা বটতলায় বসে আছেন সেই ভৈরবী—যিনি কখনও ঘুমোন না। একটু দূরে অন্ধকার, শ্মশানেশ্বর শিব। চাঁদের আলোর আভায় জমাট শিবলিঙ্গ। ছোট্ট তাঁর মন্দির। চূড়ার ত্রিশূল উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে। ঝুলছে ঘণ্টা। টিং টিং শব্দ হচ্ছে। বাতাস যেন আরতি করছে।

বটতলার একটু দূরে, মাটিতে যেখানে পাতার ছায়া দুলছে, সেইখানে নামান হল বাবার খাট। পাতার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো মুখে পড়েছে। চাঁদ দেখছে বাবাকে। এমন একটা রাত বাবা দেখতে পেলেন না। বিশুদা গামছা কোমর থেকে খুলে কপালের ঘাম মুছলেন। শ্মশানের পুরোহিত এগিয়ে এলেন। একটা ফর্দ তৈরি হল। কাঠ ক'মণ লাগবে! এক টুকরো চন্দনকাঠ। একটা মালসা। বিশুদা ছুটলেন, সব জোগাড় করতে। চিতার জায়গায় কাঠ এসে পড়ল। ভৈরবী এসে বলল, 'কে এই মহাসাধক। আহা! মনে হচ্ছে যোগনিদ্রায় শুয়ে আছেন।'

পুরোহিত আমাকে ডাকলেন। একপাশে প্যাকাটির আগুনে পিণ্ড পাক হচ্ছে। বিদেহীর শেষ আহার। চৌকোণা একটা জায়গায় গোবর লেপা হল। পুরোহিতমশাই আমার হাতে একটা কুশ দিয়ে বললেন, 'চতুষ্কোণ রেখা আঁকো। আমি মন্ত্র বলছি। তুমিও বলো, অপহতাসুরা-রক্ষাংসি বেদিসদঃ।' মন্ত্র বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার যেন একটা ঘোর লেগে গেল। কি যেন একটা ভর করল আমার শরীরে। সেই চতুষ্কোণ জায়গায় পুরোহিত মশাই কুশ বিছিয়ে দিলেন। আবার

মন্ত্র। বললেন, 'প্রেতের আবাহন করো।' ভীষণ রাগ হল। বাবাকে প্রেত বলছেন। পুরোহিত বললেন, 'মন্ত্র পড়ো, এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভি।' একের পর এক মন্ত্র পড়ে গেলেন পুরোহিত। সঙ্গে আমিও পড়ছি। যতই পড়ছি, ততই মনে হচ্ছে আমি পৃথিবীর বাইরে চলে যাচ্ছি। একেবারে অন্য একটা জগতে। যেখানে মানুষ নেই, চাঁদ নেই, সূর্য নেই। শুধু প্রেত। পিণ্ড দিলাম, জল, তিল। শ্মশানের এককোণে বসে এই কাজ হল। এরপর আর এক পরীক্ষা। আমার হাতে ঘি দিয়ে বলা হল, বাবার সারা শরীরে মাখাও। ফুল সাজানো খাট পড়ে আছে একপাশে। বাবা শুয়ে আছেন কাঠ সাজানো চিতায়। সুন্দর নিটোল একটি দেহ। সোনার বর্ণ। পুরোহিত বললেন, 'নাও, সারা গায়ে ভালো করে ঘি মাখাও। ঘি মাখালে তাড়াতাড়ি জ্বলে যাবে।' আমার ভীষণ রাগ হল! প্রেত, জ্বলে যাবে, এসব কি কথা!

ঘি চপচপে হাত দুটো আমার একবার এগলো একবার পেছলো। কেমন করে হাত ঠেকাবো ওই শরীরে! এ কেমন নিয়ম আমাদের শাস্ত্রের। মাত্র দু'পা দূরে দাঁড়িয়ে ছবি। ছবি বললে, 'যা বলছেন করো। ভয় পাচ্ছ কেন?' ছবি সত্যিই সাধিকা। জন্মসাধিকা।

হাত ঠেকালুম বাবার শরীরে। পাথরের গেলাসের মতো ঠাণ্ডা। আমার একটু ভয়ই করছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে-ভয় কেটে গেল। শীতকালে মাঝেমাঝে বাবাকে যেরকম তেল মাখাতুম, সেইভাবে ঘি মাখাতে লাগলুম সারা শরীরে। ভুলেই গেলুম, দেহ আছে, প্রাণ নেই। পুরোহিত গম্ভীর গলায় বললেন, 'হয়ে গেছে। এই নাও জল। ছেটাও। মন্ত্র বলো, গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ। কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম।' বিরাট মন্ত্র। কিছু আমার উচ্চারণ হল। কিছু উচ্চারণ হল না। তবু এ মন্ত্রটা ভালো।

আমি সরে আসা মাত্রই কাঠের ওপর কাঠ চাপানো হল। মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি। চিতা সাজাবার কি কায়দা। কাঠের ফাঁকে বাবা শুয়ে আছেন। নরম বিছানা নয়, বালিশ নয়, কাঠ। একগোছা প্যাঁকাটিতে আগুন ধরিয়ে আমার হাতে দিলেন।

'কি করব আমি?'

'অগ্নিসংযোগ করো। মাথায়। তার আগে চিতা প্রদক্ষিণ করো।'

প্রদক্ষিণ করে এসে বাবার মাথার কাছে দাঁড়ালুম। উল্টোদিক থেকে বাতাস বয়ে আসছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে। ভয় হচ্ছে পুড়ে যাবো। তা পুড়েই যদি যাই ক্ষতি কি? আমার গোকুলবাবার সঙ্গে আমিও না হয় পুড়ে গেলাম। আমার আর একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। গোকুলবাবা নেই, এইবার আমাকে বাঁচতে গেলে ভীষণ কষ্ট করতে হবে।

পুরোহিত বললেন, 'মন্ত্র বলো। দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্বে এনং দহন্তু। নাও মাথায় আগুন ঠেকাও।' আগুন ঠেকাবার সময় আমি চোখ বুজিয়ে ফেললুম। বাবার দেহে ছ্যাঁকা লাগবে।

পুরোহিত বললেন, 'কি হল? আগুন দাও?'

চোখ চাইলুম। চোখ বুজিয়ে থাকার জন্যে হাত সরে গিয়েছিল। মাথায় আগুন দেওয়া মাত্র বাবার অমন সুন্দর একমাথা চুল পড়পড় করে পুড়তে লাগল। কালো ছাই সুতোর মতো বাতাসে উড়ছে। পুরোহিত আমার হাত থেকে আগুন ছিনিয়ে নিয়ে কাঠে লাগালেন। চিতা জ্বলে উঠল।

আমি বলে ফেললুম, 'কি করলেন! পুড়ে যাবেন যে?'

প্যাঁকাটির জ্বলন্ত গোছা চিতায় গুঁজে দিয়ে পুরোহিত আমার মাথায় হাত রাখলেন, 'সকলেরই এই এক গতি বাবা। কিছু আগে আর কিছু পরে।' আমরা সবাই বটতলায় এসে বসলুম। ছবিই কেবল বসে রইল চিতার পাশে। আগুনের শিখা ক্রমশই লাফিয়ে লাফিয়ে উঁচুতে, আরও উঁচুতে উঠছে। যেখানে বসে আছি, সেইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, গনগনে আগুন গোকুলবাবার শরীর ঝলসে কালো আরও কালো হয়ে যাচ্ছে। ফকিরবাবা হাত ধরে ছবিকে তুলে আনলেন।

সারাটা রাত সেই আগুন জ্বলে জ্বলে ভোরের দিকে নিবে এল। আকাশে যেই লাল রঙ ধরল, পড়ে রইল একমুঠো ছাই। গোকুলবাবা কোথায়। ওই যে ছাই। বিশুদা সেই ছাই খুঁজে নাভিটা বের করে একটা মাটির ঘটে ভরে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'চলো গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে।'

সামনেই ভরা নদী। দু-কূল ছাপিয়ে চলেছে তরতর করে। শেষ রাতে জোয়ার এসেছিল। মাছধরা সব নৌকো মাঝগঙ্গায় জাল ফেলে বসে আছে। নাভি বিসর্জন দিয়ে একঘট জল এনে চিতায় ঢেলে

দিলুম। কিছু ছাই কিছু ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠে গেল। বিশুদা বললেন, 'ঘটটা আছাড় মেরে ভেঙে দাও।' এক আছাড়ে ঘট ভেঙে গেল। সব ফাঁকা। কত পাখি! দিন এসেছে। নতুন দিন। কেউ শিষ দিচ্ছে, কেউ শুধু কিচিরমিচির করছে। প্রভাতী কীর্তন গাইতে গাইতে আসছে পাঠবাড়ির বৈষ্ণবের দল। পৃথিবীর কিছুই বদলাল না। কেবল বদলে গেল আমার জীবন।

।। ষোল ।।

আমরা সবাই গঙ্গায় নেমেছি স্নান করতে। আমাদের চারপাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ফুল চিতার কাঠকয়লা। পৃথিবীটা মনে হচ্ছে একেবারে ফাঁকা। ফকিরবাবা হঠাৎ সাঁতার দিতে শুরু করলেন। সাঁতার কাটতে কাটতে চলে গেলেন মাঝগঙ্গায়। আমরা অবাক হয়ে দেখছি। কি শক্তি ওই অত বড় একটা শরীরে! ভরা গঙ্গা। ফকির এগিয়ে চলেছেন তরতর করে। ফেরার নাম নেই। বিশুদা বললেন, 'কি ব্যাপার। গঙ্গা পার হবেন না কি?' আমরা কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছি। হাঁ করে দেখছি, ফকিরের সাঁতার কাটা। মাঝগঙ্গা পার হয়ে গেছেন। আর তেমন দেখা যাচ্ছে না। ছোট্ট এতটুকু একটা বিন্দুর মতো এগিয়ে যাচ্ছেন ওপারের দিকে। বিশুদা বললেন, 'বাবার হঠাৎ এমন সাঁতার কাটার ইচ্ছে হল কেন?' আমরা হতভম্ব হয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো। ভোরের গঙ্গা। ভিজে ভিজে বাতাস বইছে। ভিজে গা, ভিজে কাপড়। ভীষণ শীত করছে। হঠাৎ আমাদের কানের কাছে বেজে উঠল ফকিরবাবার স্পস্ট কণ্ঠস্বর—'যে ভাবে এসেছিলুম সেইভাবেই চলে যাচ্ছি।' এত স্পষ্ট, মনে হল, ফকির আমার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। সকলেরই সেইরকম মনে হল। বিশুদা বললেন, কাঁদতে, কাঁদতে, দূরের দিকে আঙুল তুলে, 'কি নিষ্ঠুর! আমি এখন কী করবো। আমি যে তোমাকেই ধরেছিলুম।'

সন্ন্যাসী মহারাজ বিশুদার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ভাবছো কেন? আসল মালিককে ধরো। ফকিরের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। ও এইরকমই, হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। ও বলে, এক জায়গায় সাধুদের বেশি দিন থাকতে নেই। বহতা নদী, রমতা সাধু। পাহাড় ওকে টানে। গভীর অরণ্যে একা হারিয়ে যেতে ভালবাসে। ও অনেক কিছু জয় করে বসে আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, নিদ্রা। ওকে যতটুকু পেয়েছে তাইতেই তোমার কাজ হবে। তুমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। এই যেমন শুনলে। ওর অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি হয়েছে। এমনও হতে পারে ও নিজে আসেইনি। ওর ছায়া এসেছিল। একই সঙ্গে ও অনেক জায়গায় থাকতে পারে। একটা দেহকে, দশটা দেহ

করে ফেলতে পারে। ক্রিয়াযোগের শেষ অবস্থায় এইরকম হয়। চলো, এইবার আমরা ফিরি।'

সাধুবাবার কথা শুনে বিশুদা কেমন যেন হয়ে গেলেন। আমার মনে হল, আমি যদি অমন হতে পারতুম। কি করে অমন শক্তি পাওয়া যায়! সবাই তো ওইরকম হতে পারে না। না দেখলে, বিশ্বাসও করা যায় না। আমি দেখেছি, তাই বিশ্বাস করেছি। আমি সেই সাধুবাবাকে দেখেছি—ধ্যানে বসে মেঝে ছেড়ে ভেসে উঠেছেন ওপরে। এইসব দেখাও তো মানুষের মহাভাগ্য। এইসব দেখছি বলেই তো সাধু হবার ইচ্ছে করছে। এই যে আমার সামনে হেঁটে চলেছেন সন্ন্যাসী ঠাকুর, দেখলেও আনন্দ হয়। লম্বা, সোজা। গেরুয়া গায়ের রঙ। ভিজে গেরুয়া আর গায়ের রঙ একেবারে মিলে গেছে। হোমের মতো গন্ধ। যেন ভেতরে চব্বিশঘণ্টা আগুন জ্বলছে। ঘি আর বেলপাতা পড়ছে। মাঝে মাঝে তুলসীর গন্ধ পাই। মাঝে মাঝে গোলাপের। কখনো গোবিন্দভোগ চালের পায়েসের। সন্ন্যাসী ঠাকুর কত পবিত্র তা আমি বুঝতে পারি। মানুষের মতো দেখতে হলেও মানুষ নন। আমার গায়ে যখন হাত রাখেন আমি বুঝতে পারি। আমার শরীরে একটা কিছু এসে ঢুকছে। একটা শক্তি, একটা তরঙ্গ।

আমরা যে-পথে ফিরছি, সেই পথের দু'ধারে বড় বড় লোকের বাগানবাড়ি। পাঁচিলের ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে নানারকম গাছ। ফুলে ফুলে ভরা। ফুল ঝরে পড়ে আছে। রাস্তায়। গুলঞ্চ, কাঠচাঁপা। টগর, করবী। আমাদের কাপড়ের জল ছড়িয়ে যাচ্ছে ফোঁটা ফোঁটা। সিপ সিপ আওয়াজ হচ্ছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পা-দুটো যেন রঘুবীরের পা। ছবি যেন ঠিক ভোরের আকাশের মতো। সন্ন্যাসী ঠাকুর মাঝে মাঝে গম্ভীর গলায় বলছেন, 'হরি নারায়ণ।'

ফিরে এলুম বাড়িতে। এই সময় গোকুলবাবা স্নান করে এসে তারে ভিজে কাপড় মেলতে মেলতে স্তোত্র পাঠ করতেন। তার আছে, কাপড় আছে, মানুষটি নেই। বকুলতলার বেদিতে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন মা। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিবেশী দু'জন মহিলা ছিলেন। তাঁরা আমাদের হাতে নিমপাতা দিয়ে বললেন, 'চিবোও।' শ্মশান থেকে আসার পর নিমপাতা চিবোতে হয়। একজন দড়িতে বাঁধা একটা লোহার চাবি আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী

ঠাকুর বললেন, 'তোমার দশদিন অশৌচ। নিজে হাতে রেঁধে হবিষ্য করবে। বিশু মালসা, প্যাকাটি যা লাগে সব এনে দেবে। তোমরা সবাই এই নিয়ম পালন করবে। আর এই দশদিন, এ-বাড়ির নারায়ণের পুজো করবেন অধ্যাপক।'

সন্ন্যাসী ঠাকুর চলে গেলেন আশ্রমে। যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমি আবার আসছি। ভেবো না, তোমরা একা হয়ে গেলে। আমরা সবাই আছি। কিচ্ছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ চলে যাবার পরেও তার ইচ্ছেটা কাজ করে। ইচ্ছার মৃত্যু হয় না।'

যখন কিছুই বুঝতে পারছি না, এইবার আমরা কি করব, আমাদের কি করা উচিত, সেই সময় গোকুলবাবার স্কুলের সমস্ত শিক্ষক আর ছাত্ররা এলেন। আমাদের বড় উঠোনটা একেবারে ভরে গেল। তাঁরা ফুল এনেছেন, মালা এনেছেন। কাকে পরাবেন! সব একে একে রাখা হল খাটে। যেন একটা ফুলের মানুষ তৈরি হয়ে গেল। রকের ওপর প্রধান শিক্ষক মহাশয় দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট্ট-খাট্টো গম্ভীর চেহারা। সামনের উঠোনে আর সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নিচু করে। প্রধান শিক্ষক বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পড়তে লাগলেন —'আজ আমরা সর্ব-অর্থে একজন মহামানবকে হারালাম। গৃহী হলেও তিনি ছিলেন পুরোপুরি সন্ন্যাসী। নির্লোভ, নিরহঙ্কারী। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নিঃস্বার্থ দেশসেবী, কোনও দিন কোনও পুরস্কারের প্রত্যাশা করেননি। যদি করতেন তাহলে আজ তিনি মন্ত্রী হতেন। দেশের ইতিহাস প্রচারবিমুখ এই মানুষটির কথা লিখে রাখবে না। তাঁর নাম লেখা থাকবে আমাদের অন্তরে। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি তাঁর প্রাণ দিয়ে পড়াতেন, জ্ঞান দিয়ে নয়। তাঁর অনেক ছাত্রই আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

প্রধান শিক্ষকের চোখে জল। তিনি আর পড়তে পারলেন না। ঘরে ঢুকে কাগজটা খাটে রাখতে রাখতে বললেন, 'এইভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন? এটা কি ভাল হল !!' প্রধান শিক্ষক চলে যাবার পর বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। নেমে এলেন গ্রামের বিখ্যাত জমিদার, সান্যালমশাই। রকের একপাশে বসে পড়লেন। কোনও আড়ম্বর নেই, অহঙ্কার নেই। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা কোথায়?' মা বেরিয়ে এলেন। পাশে ছবি। সান্যালমশাই হাত তুলে

নমস্কার করে বললেন, 'অপূরণীয় ক্ষতি। এমন মানুষ লক্ষে এক-আধজন আসেন। শোকের কোনও সান্ত্বনা হয় না। সহ্য করতে হয়। সহ্য করতে হবে।' সান্যালমশাই হাত তুলে গাড়িতে কাকে ইশারা করলেন। সেই লোকটি গাড়ির পেছন খুলে একে একে সব জিনিস নামাতে লাগলেন। এক বস্তা চাল, ঘিয়ের টিন, ফল। মা অবাক হয়ে দেখছেন। একবার মৃদুগলায় বললেন, 'এই সব কি করছেন?'

সান্যালমশাই বললেন, 'এ আমার শ্রদ্ধা। তিনি নেই, আমরা আছি।'

সান্যালমশাই এরপর একটা খাম বের করে রকের একপাশে রেখে বললেন—'দশ হাজার টাকা রইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম যেন ভালভাবে হয়। আরও প্রয়োজন হলে জানাবেন। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। আমিও তাঁর এক সন্তান।' সান্যালমশাই ধীর পায়ে হেঁটে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। মা বলতে লাগলেন—'টাকা, এত টাকা! টাকা আমি কি করব! এত টাকা! এত টাকা!'

খামটা পড়েই রইল। ছবি একটা ঝুড়ি চাপা দিয়ে দিল। টাকা দান করে গেছেন একজন। দান স্পর্শ করা হবে না। গোকুলবাবা কখনও কারোর কাছে হাত পাতেননি। পড়ে রইল চালের বস্তা, ঘিয়ের টিন, ফলের ঝুড়ি। অনেক পরে সন্ন্যাসী মহারাজ যখন এলেন; মা জিজ্ঞেস করলেন—কি করা হবে, এই চাল, ঘি, টাকা। সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন—'স্পর্শ করবে না। আবার দাতাকেও অসম্মান করবে না। প্রত্যাখ্যান মানে অহঙ্কার। বিশুকে দিয়ে এই সমস্ত জিনিস, টাকা পাঠিয়ে দাও অনাথ আশ্রমে। টাকাটা বরং দিয়ে দাও গোকুলের স্কুলে। ওই টাকায় গোকুলের নামে একটা প্রাইজ দেবার ব্যবস্থা হোক।'

মা বললেন, আমাদের তো কোনও রোজগার নেই। সঞ্চয়ই নেই এক পয়সা। সংসার চালাবার জন্যে আমাকে একটা কিছু করতে হবে তো! বসে থাকলে তো চলবে না।'

'তুমি কি করবে মা? তুমি ঘরের বউ। কেমন মানুষের বউ, যে ছিল মহাসাধক। তোমার তো বাইরের কোনও কাজ করা শোভা পায় না। আর কি-ই বা করতে পারো তুমি! এ সব কথা তুমি এখনই ভাবছ কেন? কাজকর্ম মিটে যাক তারপর একসঙ্গে বসে ভাবা যাবে।'

'আমার হাতে আর মাত্র তিন-চারদিন চালাবার মতো টাকা আছে।'

'ওই তিন-চার দিনই চলুক না।'

প্যাকাটির আগুনে মালসায় ভাত রাঁধতে রাঁধতে সব শুনলুম। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যাচ্ছে। নতুন মালসা আর আলোচালের গন্ধ, মুগের ডালের গন্ধ, কাঁচকলার গন্ধ নাকে এসে লাগছে। আগুনের হলকায় মুখ পুড়ে যাচ্ছে। তখনই সংকল্প করে ফেললুম—যে-ভাবেই হোক আমাকেই রোজগারে বেরোতে হবে। আমার বাবা মারা গেছেন, আমার মা, আমার বোনকে তো আমাকেই দেখতে হবে। কষ্ট করব। ভীষণ কষ্ট। এই আগুনই আমাকে ঝলসাবে। নাহয় ছাতুই খাবো। রেলগাড়ির ফেরিঅলা হবো। চায়ের দোকানের বয়। সাধুবাবা বলেছেন তিরিশটা বছর ভাগ্য আমাকে পিষবে। তা পিষুক। আমি সহ্য করব। প্যাকাটির ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। ভাতে ফুট ধরেছে। আমার গলার লোহার চাবিটা দুলছে। কানের কাছে শুনতে পেলুম ফকিরের স্পষ্ট কণ্ঠস্বর—বিশ্বাস রাখ, বিশ্বাস। ধরে থাক। ধরে।

॥ ১৭ ॥

দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল। দিনের ধর্মই হল, দিন চলে যাবে। ধরে রাখা যাবে না কিছুতেই। দিনের ধর্মই হল, সব কিছু বদলে দেবে। জনপদের চেহারা পাল্টাবে। পুরনো বিশ্বাস টলে যাবে। আদর্শ ভেঙ্গে যাবে। কত মানুষ আসবে. কত মানুষ যাবে। আমি আছি। সময় এখনও আমাকে মারতে পারেনি ; কারণ আমি একজনকে ধরেছিলুম। ধরেছিলুম ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। আমি ধরি নি। আমি আমার হাতটি তুলে দিয়েছিলুম তাঁর হাতে—ঠাকুর তুমি ধরো। গোকুলবাবার সমস্ত বইয়ের মালিক হয়েছিলুম আমি। সেই সংগ্রহের মধ্যে ছিল, কথামৃত। কেন জানি না, আমি পড়তুম। আমার ভাল লাগত। সেইখানেই লেখা আছে দেখলুম—ছেলে যদি বাপের হাত ধরে, সে হাত ছেড়ে যাবার ভয় থাকে, আর বাপ যদি ছেলের হাত ধরে তাহলে ভয় থাকে না। ঠিক আল পার করিয়ে দেবে। হনুমানের বাচ্চা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, তাই মাঝে মাঝে হাত খুলে ধুপুস করে পড়ে যায় ; কিন্তু বেড়ালের ছানা! বেড়ালের ছানা কেবল মিউ-মিউ করে মা'কে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখনও হেঁশেলে, কখনও মাটির ওপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।

এই কথাটিই আমার জীবনে সার করে নিলুম। আমার আর কে আছে ঠাকুর, তুমি ছাড়া। মা, গোকুল মা, তিনি তো সত্যিই আমার মা নন। তিনি ছবির মা। তবু তিনি আমার জন্যে কি না করেছেন! শুধু পেটে ধরলেই মা হয়! তা নয়। এটা আমি এই জীবনের মতো বুঝে গেছি। মায়ের অভাব তিনি আমাকে একেবারেই বুঝতে দেননি। আমার ভয়ঙ্কর অভিমান হয়েছিল, গোকুলবাবার মৃত্যুর পর কেন আমাকে আশ্রমে থাকতে দেওয়া হল না? কেন সাধুজী আমাকে বললেন। 'গৃহই তোমার স্থান। গৃহেও সন্ন্যাসীর মতো থাকা যায়। সেইটাই সবচেয়ে বড় সাধনা। গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী

হয় না। মনটাকে সন্ন্যাসীর মতো কর। আর সংসারে থাকলেই সেটা সম্ভব হয়। যত জ্বলবে, পুড়বে ততই তৈরি হবে খাঁটি সোনা। আশ্রমে মানুষ হলে, তুমি নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে শিক্ষার তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। যুগোপযোগী শিক্ষা না পেলে, তোমার শরীরটাই বড় হবে, মন বড় হবে না। এই আশ্রমের আপাতত যা চেহারা, তা অনেকটা বার্ধক্যের বারাণসীর মতো। কিছু বুড়ো আর অর্ধোন্মাদ এখানে একসঙ্গে মিলেছে। হাঁচি, কাশি, পেটখারাপ, মনখারাপ, বাতের ব্যথা, দাঁতের ব্যথা, পিত্তশূল, অম্লশূল এই হল গিয়ে এই আশ্রমের পরিবেশ। বড় লোকের দান ছাড়া, না বিগ্রহভোগ না মনুষ্যভোগ, কিছুই হবে না। ধর্মালয় না বলে ভিক্ষালয় বলাই ভাল। আমার কী। আমার তো হিমালয়ে পাকা ডেরা আছে। তেমন বুঝলে পালাব। তখন তোমার কী হবে! বুড়োদের খিদমৎ খেটে আধদামড়া থেকে দামড়া হবে। এদের কী ধারণা জান, যে ম্যাজিক দেখাতে পারে সে-ই এক আচ্ছা সন্ন্যাসী। শূন্যে ভাসতে হবে, আঙুলের ডগা থেকে আগুন বের করতে হবে, গায়ে আঙুল ঠেকালে কারেন্ট মারবে। শূন্যে হাত ঘুরিয়ে রাজভোগ ধরতে হবে। এরা সন্ন্যাসী চায় না, চায় ভূত। ধ্যান করতে বললে, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। জপ করতে বললে, মনে মনে টাকা গোনে। এ তোমার স্থান নয়। জনারণ্যে মিশে যাও। জীবন দেখ। জীবনের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষা নাও। জীবনই জীবনের গুরু।

আমার তখন মনে হয়েছিল, যা-কিছু হচ্ছে, সবই ছবির জন্যে। সকলেই তখন একবাক্যে বলছেন, ছবি শক্তির অংশ। বহু বছর অপেক্ষার পর হঠাৎ এমন একজন সাধিকা এসে পড়েন। শৈশব-লীলা থেকেই ধরা পড়ে, তিনি এসেছেন। তাঁর চেহারা, হাবভাব, চাল-চলন, সেই ইঙ্গিতই দেয়। কথাটা ঠিকই। ছবির থেকে থেকে ভাব-সমাধি হয়। ছবি কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, কখনও গায়। আমার দিকে যখন তাকায়, মনে হয় কোন দূর থেকে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার ভেতরটাও সে দেখতে পাচ্ছে। আমি যেন একটা কাঁচের মানুষ। ছবির সামনে গেলে, আমি একটা কেঁচোর মতো হয়ে যেতুম। ছবি আর ফিরতে পারল না তার পথ থেকে।

সোজা সে এগিয়ে গেল তার পথে। কোনও কিছুই গ্রাহ্য করল

না। আশ্রমটা হয়ে উঠল ছবির আশ্রম। সন্ন্যাসী মহারাজ চলে গেলেন আরও উচ্চাবস্থায়। পাথরের উজ্জ্বল বিগ্রহের মতো তাঁর চেহারা হয়েছিল। সবাই বলত, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব।

আশ্রমটা অদ্ভুতভাবে ঘুরে গেল। হয়ে গেল মেয়েদের আশ্রম। অধ্যাপক তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় ছোট একটা স্কুল সত্যই করলেন। হাইস্কুল হল না। হল প্রাইমারি। আশ্রমে আমার স্থান হল না। সন্ন্যাসী মহারাজ স্থির চোখে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপন মনেই, আমাকে বলার জন্যে নয়, 'থোড়া কমতি হ্যায়।'

এলাকায় হিন্দুস্থানীর সংখ্যা কম ছিল না। বয়েস কম হলেও ভাষাটা বুঝেছিলুম। আমার একটু কম আছে। কী কম! তখন তো বুঝিনি। অভিমানে চোখ ফেটে জল এসেছিল। সন্ন্যাস কি জিনিস, ধর্ম আসলে কি, জানা ছিল না। গেরুয়া পরে, মাথা কামিয়ে ঘুরবো, সে তো বেশ মজা! সবাই এসে প্রণাম করবে, মালা পরাবে, মিষ্টি, ফল, প্রণামী দিয়ে যাবে। আর কি চাই!

আমি মায়ের সংসারে আশ্রয় পেলুম। আর আমার সেই মায়ের কি হল! সংসার চলবে কি ভাবে! কি জানি কেন, মায়ের মন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। আশ্রমের নামে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। সাধুজীর ওপর ভীষণ রাগ। মা বলতে লাগলেন, যত সব পাপী, যত অলস, সব এক জায়গায় জড় হয়েছে। ওই আশ্রম, আশ্রম করে মানুষটা অকালে চলে গেল। আমার অমন সুন্দর মেয়েটা পাগলী হয়ে গেল। তুই ও-তল্লাটে একেবারে যাবি না। কোনও সাহায্য নিবি না। আমরা পরিশ্রম করে বাঁচবো। আমরা খেটে খাবো। যা জোটে। ভগবান ভরসা।

'মা, তুমি ভগবানের নাম করছ কেন?'

'বোকা, ভগবান তো আছেনই। তবে মন্দিরে নেই, মসজিদে নেই, আছেন মানুষের বিশ্বাসে। মানুষের পেছনে না ছুটে, বিশ্বাসের পেছনে ছোট। সন্দেশ খাবি? আপেল খাবি? গোবিন্দভোগ চালের পায়েস খাবি? তার জন্যে ভগবানকে কেন ধরবি? তিনি ময়রা? না চাষা। লেখাপড়া শেখ, ভাল চাকরি কর, সব পাবি। ভগবানের কাছে ভোগ চাইতে নেই। কোনও কিছু চাইতে নেই। বলতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে, আমি তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। তোমার

যা ইচ্ছা, তাই করো। আমি ওদের দেখাতে চাই, ওদের চেয়েও আমি ধার্মিক।

মায়ের তেজ দেখে, আমারও তেজ এসে গেল। ঠিকই তো! মৃত্যু দেখলুম, ম্যাজিক দেখলুম। ফকীরের ভেলকি দেখলুম, আর কিছু দেখতে চাই না। একজন বললেন, তোমার একটা রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি—একজন বৃদ্ধ মানুষের সেবা!

'আমি পারবো?'

'ইচ্ছে থাকলেই পারবে। ব্যাপারটা তেমন কঠিন নয়। সেই বৃদ্ধকে তুমি চেন। জমিদার প্রাণগোপাল চৌধুরী। অতি ভাল মানুষ। আর সেবা হল, সকাল, বিকেল তাঁকে পড়ে শোনাতে হবে। সকালে কাগজ, আর রাতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। তুমি নিশ্চয় পড়তে পারো?'

'হ্যাঁ, পড়তে আমি ভালই পারি।'

'তাহলে তো হয়েই গেল। আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। সেটা বিকেলে। রোদ চলে যাবার আগে, ঘণ্টাখানেক বেড়াতে হবে তাঁকে নিয়ে, তাঁরই বাড়ির বাগানে। মানুষটিকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারো, তোমাদের কোনও অভাব থাকবে না। ভীষণ ভাল মানুষ। জ্ঞানী, দাতা। জমিদার বলতে যা বোঝায় তা নয়।'

'মাকে বলুন। মা অনুমতি দিলে আমি করব।'

'তোমার মাকে আমি বলব।'

প্রথমে মা আপত্তি করলেন, 'ও পড়বে কখন?'

'কেন? প্রচুর সময়। সকালে পড়বে। বিকেলে তো খেলে! সেই খেলাটা হবে বেড়ানো। রাতে পড়বে। পড়া তো আটকাচ্ছে না।'

মা ভাবলেন। ভেবে বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। ঠিক আছে করবে।'

ভদ্রলোক বিকেলে আমাকে নিয়ে গেলেন জমিদার বাড়িতে। বিশাল গেট। বিরাট দারোয়ান। বাগান। মাঝখান দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে। প্রাসাদের মতো বাড়ি। এতদিন বাইরে থেকে দেখতুম। ভেতরে ঢুকে ভয় করতে লাগল। সবই যেন অন্যরকম। বড়লোকেরা কেমন সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকেন! আমি হাঁ হয়ে দেখছি, আর পায়ে পায়ে এগোচ্ছি। সামনেও যেমন বড় বাগান, পেছনেও তেমনি বড় বাগান। কত রকমের ফুল। ভগবান খুব জোর দিয়েছেন। বাগানে

কত রকম বসবার ব্যবস্থা। এক জায়গায় একটা সুন্দর দোলনা রয়েছে। মনে মনে ভাবছি চাকরিটা যদি হয় বেশ মজা হবে। রোজ এই বাগানে ঘুরতে পারবো। এই ফুল, এই গাছ, আর কি চাই! জমিদারবাবুর লাইব্রেরিতে গিয়ে হাজির হলুম আমরা। ঠিক ঋষির মতো চেহারা। এক মাথা সাদা ধবধবে চুল। টানা, টানা নীল চোখ। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। কালো পাড় ধুতি। হাতের প্রায় সব আঙ্গুলে একটা করে আংটি। বসে আছেন চওড়া হাতলঅলা আরাম চেয়ারে। পাথরের গেলাসে ঘোল। সেই ঘোল তিনি চুমুকে চুমুকে খাচ্ছেন। দেখে খুব ভাল লেগে গেল। এমন মানুষের সেবা করতে হচ্ছে করে। লাইব্রেরিতে কত যে বই! চারটি দেয়ালই বইয়ে ভরে আছে। ঘরটা যেমন উ'চু, তেমনি বড়। মেঝেতে শ্বেত পাথরের। পরিষ্কার, ঝকঝকে, মন্দিরের মতো। মাঝখানে বিশাল্ বড় এক টেবিল। পালিশ কি তার! মুখ দেখা যায়। চারপাশে চেয়ার সাজানো।

আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'ও, অশ্বিনী! তোমরা এসে গেছ! এই ছেলেটির কথা বলেছিলে! তোমরা ওই চেয়ারে গিয়ে বোসো।' গলা খুব গম্ভীর হলেও, গানের মতো। যেন গান গেয়ে এই কথাগুলো বললেন। আমরা কোনও শব্দ না করে, দুটো চেয়ার টেনে বসলুম। বেশ একটু ভয় ভয় ভয় করছে। তিনি আমাদের দেখছেন বলেই আমি টেবিলেও হাত রাখছি না, যদি পালিশ চটে যায়। দারুণ সুন্দর একটা ছবির বই পড়ে আছে, একটু দূরে, সেদিকে হাত চলে যেতে চাইছে, যেতে দিচ্ছি না। শাসনে রেখেছি। কোনও দিকে তাকাচ্ছি না। একেবারে ধ্যানে বসার মতো বসে আছি চুপ করে। এখানে-ওখানে পেপারওয়েট নানারঙের। ভেতরে ফুলের শোভা। নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। দেখছি না।

জমিদার মশাই আরাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোঁচাটা সাদাফুলের অঞ্জলির মতো লুটিয়ে পড়ল পায়ের ওপর। পায়ে ঝকঝকে কালো বার্নিশ করা চটি। তিনি এসে আমাদের সামনের চেয়ার বসলেন। মিহি একটা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

হাসলেন। সামনের দাঁত দুটো ঝকঝক করছে।

বললেন, 'প্রথম পরীক্ষায় তুমি পাশ করলে। চেয়ার সরিয়েছ, শব্দ না করে। টেবিলে হাত রাখনি। বইটা ধরে টান নি। পেপারওয়েট

নিয়ে খেলা করোনি। শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছ এতক্ষণ। ফুল মার্কস। এইবার তোমার দ্বিতীয় পরীক্ষা। সেকেন্ড-পেপার। যাও, বইয়ের র‍্যাক থেকে রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি বইটা নিয়ে এস।'

চেয়ারটাকে আস্তে করে সরিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম। এইবার আমার কঠিন পরীক্ষা। অত বই! কোথায় আছে চোখের বালি। হঠাৎ মনে পড়ল, 'চোখের বালি' হল উপন্যাস। গোকুলবাবা বইটা পড়তেন। উপন্যাসের প্রথম অক্ষর উ! প্রতিটি বইয়ে নম্বর দেওয়া আছে। ধর্ম, বিজ্ঞান, জীবনী, প্রবন্ধ। এক নজরে চারটে দেয়াল দেখে নিলুম। উত্তরের দেয়ালের র‍্যাকের সমস্ত বইয়ে উপন্যাসের টিকিট মারা। আর আমাকে পায় কে। সোজা উত্তরের দেয়ালে চলে গেলুম। বেশ বুঝতে পারছি, জমিদার মশায়ের চোখ আমাকে অনুসরণ করছে, বেশ বুঝতে পারছি তিনি একটা উৎকণ্ঠায় আছেন, ছেলেটা কি করে? র‍্যাকের সামনে দাঁড়াতেই আর একটু বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। উ-র পাশে র থাকা উচিত। রবীন্দ্রর র। অ, আ করে যাবে। এখন বর্ণমালার শুরু ওপর থেকে না নিচে থেকে। ভাগ্য আমার সত্যিই ভাল। ওপর থেকে নামছে। র একেবারে আমার চোখের সামনে। বেশ বুঝতে পারছি, কেউ আমার ভেতরে বসে বলছেন, তুমি এইবার এই করো, তুমি এইবার ওই করো। তিনি আমার গোকুলবাবা। তিনি বলছেন, ভয় পেয়ো না। ঘাবড়ে যেয়ো না। সাহস রাখো। বিশ্বাস রাখো। চোখের বালি পেয়ে গেলুম। হাতে নিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াতেই, তিনি বললেন, 'বাঃ, এই তো চাই। একেবারে ফুলমার্কস। এইবার তোমার তৃতীয় পরীক্ষা। চেয়ারে বোসো, বসে বইটা খোলো।'

আমি তাই করলুম, যেমন বললেন।

প্রশ্ন করলেন, 'কি লেখা আছে?'

'সূচনা।'

'শেষ দশটা লাইন পড়।'

আমার মন বললে, একেবারে গড়গড়িয়ে পড়ো না। একটু থেমে থেমে, কমা, পূর্ণচ্ছেদ দেখে পড়ো; কারণ একজন শুনবেন। তুমি একজনকে শোনাবে। আমি সেইভাবেই পড়তে লাগলুম,

'বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় এক দিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্র-

নৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর এক দিকে এনেছিল গল্পে এমন কি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে।'

তিনি হাত তুলে বললেন, 'বাঃ, বাঃ, অতি উত্তম। পরিষ্কার উচ্চারণ। পড়তে তুমি জান। বুদ্ধি আছে। চটপটে। তোমাকে দিয়ে হবে। শুধু আর একটা পরীক্ষা, শেষ পরীক্ষা।'

তেমন ভয় আর করছে না, তাহলেও এত পরীক্ষার পর আবার পরীক্ষা? এই কথাই ভাবছি। জমিদার মশাই বললেন, 'দেখি, তোমার হাতের আঙুল দেখাও।'

আমি অবাক হয়ে ডান হাতটা টেবিলের ওপর মেলে দিলুম। তিনি খুব সাবধানে আমার আঙুল, আঙুলের ফাঁক আর নখ দেখে বললেন, 'অলরাইট। কাল থেকে তুমি আসবে। কখন ঘুম থেকে ওঠো?'

'ভোর চারটের সময়।'

'বলো কি? এ তো দেখি সাধু-সন্ন্যাসীর অভ্যাস! ভালই হল। তুমি তাহলে ঠিক ছটার সময় চলে আসবে। ছটা থেকে নটা। আর বিকেলে পাঁচটা থেকে সাতটা। আশা করি অসুবিধে হবে না?'

অশ্বিনীবাবু আমার হয়ে বললেন, 'এতে তো অসুবিধে হবার কথা নয়।'

জমিদারবাবু বললেন, 'আমি বলে রাখছি, ছেলেটি ভবিষ্যতে খুব বড় হবে। টাকা-পয়সার কথা, এর সামনে বলব না। তোমাকেও বলব না। যখন দোবো তখনই দেখতে পাবে। অখুশি হবে বলে মনে হয় না।'

জমিদারবাবু একটা ঘণ্টা বাজালেন। একজন লোক ছুটে এল। তিনি বললেন, 'ফল আর মিষ্টি নিয়ে এসো।'

আমি না বলে পারলুম না। একটু ভয়ে ভয়েই বললুম, 'আমি কিছু খাবো না।'

তিনি একটু গম্ভীর মুখে বললেন, 'কেন খাবে না? আমিও তো খাবো তোমাদের সঙ্গে।'

কারণটা বলতে লজ্জা করছিল, পাছে রাগ করেন তাই বলতেই হল। আমি যা পারব না, তা পারব না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'খাবে না কেন? লজ্জা, ভদ্রতা!'

সাহস করে বললুম, 'আমার মা যা খান না, আমি তা খেতে পারি না। আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। আমার কষ্ট হয়।'

বড় বড় চোখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখ দুটো তাঁর জলে ভরে এল। ধরা গলায় বললেন, 'কি সুন্দর! কি সুন্দর। তোমাকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা, তুমি যা খাবে, তোমার মায়ের জন্যেও আমি যদি সেই খাবার বেঁধে দি! তাহলে তো আপত্তি হবে না!'

'আমার মা বকবেন। বলবেন, তুই চেয়ে আনলি কেন?'

'কিন্তু, সকাল, বিকেল যে তোমাকে বাবা আমার সঙ্গে জলখাবার খেতে হবে। তোমার শরীর-স্বাস্থ্য যে আমাকে দেখতে হবে।'

'আমার মা যা খান, আপনি যদি তাই আমাকে দিতে পারেন তাহলে আমি খেতে পারি।'

'কি সেই জিনিস?'

'আজ্ঞে রুটি আর গুড়।'

জমিদার মশাই অশ্বিনীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি এই সমস্যার কোনও সমাধান করতে পার অশ্বিনী? এমন ছেলে তো আমি দেখিনি। এমন মাতৃভক্তি।'

অশ্বিনীবাবু বললেন, 'আপনি ওই খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামার মধ্যে নাই বা গেলেন। ছেলেটার সব ভাল; কেবল একটু এক-বগ্গা।'

জমিদার মশাই হাহা করে হেসে বললেন, 'তোমার পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব। তুমি তোমার মতো করেই দেখবে। তাহলে আমাকেই একবার যেতে হয়।'

'আপনি এই পরিবারটিকে চেনেন না বড়বাবু। মা কি বলবেন জানেন, ভালমন্দ খেয়ে আমরা আমাদের অভ্যাস নষ্ট করতে চাই না। আমরা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যেই থাকতে চাই। যা আমরা পারব না, তা আমরা চেষ্টা করব কেন? তার চেয়ে, ও যা বলছে তাই করুন। রুটি আর গুড়।'

'তাহলে আমাকেও তো তাই খেতে হয়!'

'না, তা কেন? আপনি আপনার মতো খাবেন, আমরা আমাদের মতো খাবো। সত্যিই তো, আমরা কি কখনও আপনার মতো হতে পারবো! খাওয়া একটা প্রয়োজন। আপনি ওটাকে অত গুরুত্ব দেবেন

না। আসল কাজটা হলেই হল।'

জমিদার মশাই খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। তা আমি কি করতে পারি! আমি আমার মতো থাকব। সাধুবাবা আমাকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ, বিলাসিতা করবি না। অন্যের পয়সায় খাবি না। তাহলে তার পাপ তার কর্মফল তোকে স্পর্শ করবে।'

আশ্রমে আমি নেই; কিন্তু গোকুলবাবার বাড়ি আশ্রমের চেয়েও বড়। আমার মা সন্ন্যাসিনী না হয়েও সন্ন্যাসিনী।

॥ ১৮ ॥

সারা পাড়া নিস্তব্ধ, নিঃসাড়। রাত কিছু কম হল না। শেষ ট্রেন কখন চলে গেছে সিটিতে বিদেশ যাবার ডাক দিয়ে। আমরা ঘুমোইনি। আমি আর মা দুজনে জেগে আছি আমাদের শোওয়ার ঘরে। দোর তাড়া সব বন্ধ। আমাদের এদিকটায় আজকাল খুব চুরি হচ্ছে। এই সময়টায় মা আমাকে নিয়ে পড়াতে বসেন। কখনও আমি পড়ি মা শোনেন, কখনও মা পড়েন আমি শুনি। মায়ের উচ্চারণ যেমন স্পষ্ট সেইরকম পড়ার কায়দা। মা বলেন, 'পড়ায় প্রাণ ঢালবে। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করবে স্পষ্ট। ভাব বুঝে আবেগ মেশাবে। সেই আবেগেও যেন সংযম থাকে।' মা একটা অভিধান নিয়ে বসেন। শব্দের মানে, উৎপত্তি সব আমাকে শিখিয়ে দেন। বারে বারে বলেন, দেখিস বানানে যেন কোনও ভুল না থাকে। তার চেয়েও লজ্জার আর কিছু নেই। আমার পাশে একটা স্লেট-পেনসিল থাকে। কঠিন বানান বারে বারে লেখান। এই কাজটাকে মা বলেন, ভিত তৈরি করা।

হঠাৎ মা বললেন, 'আমার ভাগ্যটা কি সুন্দর! স্বামী চলে গেলেন। মেয়েটা, কত আশা ছিল, ভাল লেখাপড়া শিখবে, ভাল ঘরে বিয়ে হবে। কোথায় কী, ভগবান মাথাটাই খারাপ করে দিলেন। আবোল-তাবোল বকতে শুরু করলে। আবোল-তাবোল দেখতে আরম্ভ করলে। কিছু লোক অমনি নাচিয়ে দিলে তুমি ঈশ্বরী। তুমি লোহা ছুঁলে সোনা হয়ে যাবে। তোমার কী অসীম শক্তি! আমার সর্বনাশের ওপর সর্বনাশ।'

আমি বললুম, 'মা, তুমি অমন কথা বোলো না! তুমি নিজেই দেখেছ ছবির কি শক্তি। ছবি ভগবানকে পেয়ে গেছে।'

'যে ভগবানকে পায় সে কখনো তার শক্তি দেখায় না। ম্যাজিক দেখায় না। আমি এই পারি, ওই পারি বলে নেচে বেড়ায় না। সে চুপচাপ একপাশে নিজের ভাবে থাকে।'

'ছবি তো সেই ভাবেই আছে মা।'

মা চুপ করে গেলেন। উদাস হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর নিজের মনেই বললেন, 'তাই হয়তো হবে। আমার বুঝতে ভুল হচ্ছে।

আসলে আমি ভগবানের ওপর ভীষণ রেগে আছি তো! নাও, তুমি পড়ো। এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। একবার রোখ করে দেখিয়ে দাও তো, আমরাও পারি। সব বাধা ধাক্কা মেরে ফেলে দাও। ভগবানে বিশ্বাস রাখো ; কিন্তু লোক দেখানো বাড়াবাড়ি কোরো না। নিজের কাজে ফাঁকি দিয়ে ভগবান, ভগবান কোরো না। সবার আগে আমাকে একটা রোজগারের রাস্তা বের করতে হবে। ভিক্ষে তো আর করতে পারবো না!'

'ভিক্ষে কেন করবে মা! আমি তো জমিদার-বাবুর ওখানে কাল থেকে বেরোচ্ছি। যা হয় কিছু তো দেবেন।'

'ওতে তো আর সংসার চলবে না বাবা। ভাবছি সেলাই মেশিনটাকে কাজে লাগাবো। ছোটদের জামাকাপড় তৈরি করবো। পুজো আসছে, দেখি কি হয়। তোর সাহায্য একটু চাই।'

'আমি তো তোমার জন্যেই আছি মা। সাধুজী তো সেই কথাই বলেছেন।'

'আবার! সাধুটাধুর কথা আমাকে বলবে না।'

'সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর তোমার এত রাগ এসে গেল কেন মা?'

'জানি না বাবা। আমি জানি আমাকে লড়াই করতে হবে।'

'তুমি তো মা আশ্রমেও থাকতে পারতে। আশ্রমটা তো তোমারও।'

'আশ্রমে থেকে সারাদিন আমি কি করব বাবা!'

'সাধন-ভজন।'

'ওই জীবনটা যে আমার ভাল লাগে না। তোমার বাবার সঙ্গে আমি স্বদেশী করেছি। কাজ আর কাজ। জানো তো আমাদের গুরু হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেবাই আমাদের ধর্ম। ঘণ্টা নাড়া, নাক টেপা আমাদের আসে না। মানুষই আমাদের ভগবান।'

'মা, ওখানেও তো অনেক সেবার কাজ ছিল।'

'সব এলোমেলো বাবা। কোনওটাই দানা বাঁধেনি। বাঁধবেও না কোন দিন। শিক্ষা ছাড়া কিছু হয় না।'

'স্কুল তো হচ্ছে মা।'

'অত সহজ নয়। ওটা স্কুল-স্কুল খেলা হচ্ছে।'

'জমিদাবাবু ভীষণ ভাল মা। কত বই লাইব্রেরিতে।'

'দেখ, কি হয়। ভাগ্য কোন দিকে টেনে নিয়ে যায়। ওঁর খুব

সুনাম ! যেমন সুপণ্ডিত তেমনি দান-ধ্যান। ঠিক মতো ধরে থাকতে পারলে তোমার ভালই হবে।'

পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। মা বললেন, 'চলো এইবার শুয়ে পড়ি। কাল তোমাকে অনেক ভোরে উঠতে হবে।'

বাড়িটা এখন ভীষণ ফাঁকা লাগে। কেউ কোথাও নেই। দুটো মাত্র প্রাণী, আমি আর মা। বিশাল, বিশাল দুটো ঘর। দালান, উঠান। ঝিমঝিম গাছ দিয়ে ঘেরা। মা আর আমি এক বিছানায় শুই। আধো-অন্ধকারে দেখতে পাই, আমি শুয়ে পড়ার অনেক পরেও মা আছেন হাত জোড় করে স্থির হয়ে। কেউ তো নেই আমাদের। বেশ বুঝে গেছি, যে যার সে তার। যার যার, তার তার।

আমার একটা সাদা জামা আর সাদা প্যান্ট ছিল। পাট করা ছিল মায়ের ট্রাঙ্কে। ভোর বেলা কি শীত কি গ্রীষ্ম, আমাকে চান করতে হয়। সেই অভ্যাসই আমাকে করান হয়েছে। জামা-কাপড়ের মতো দেহও বাসী হয়ে যায়। সারাটা রাত ঘুম তোমাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেছে। সে তো একরকম মরে যাওয়ারই মতো। নতুন দিন শুরু করো, শুদ্ধ মনে, শুদ্ধ দেহে। 'আমি ফুল হয়ে ফুটে থাকি নতুন দিনের কোলে।' বাবা বলতেন, ভোরে চানের উপকার হল, শরীর ভাল থাকে। কখনও ঠান্ডা লাগবে না !

ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল, যেমন ভাঙ্গে। মাকে কোনও দিন আমি হারাতে পারিনি। চোখ মেলে দেখি, মা বিছানায় বসে আছেন স্থির হয়ে হাত জোড় করে। মনে হল, সকালই যেন বসে আছে মা হয়ে। আমাকে বলেন, ভগবান আমি মানি না। ভগবান বলে কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে. পৃথিবী, আছে, জন্ম, মৃত্যু ! রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। জানি, সে হল কথার কথা। রাগের কথা, অভিমানের কথা। মা ভগবানকে ভীষণ বিশ্বাস করেন। তা না হলে কেউ এমন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে।

খুব সাবধানে নেমে এলুম বিছানা থেকে। কোনও শব্দ না করে ! চৌকি, মশারি কিছু না নাড়িয়ে। জানি, যাই করি না কেন, মায়ের এই ধ্যান ভাঙ্গবে না। এ যেন সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাওয়া। মা আমার জন্যে মাজন তৈরি করে রেখেছেন। ঘুঁটের ছাই গুঁড়ো করে, ছেঁকে, তার সঙ্গে আবার নিমপাতার গুঁড়ো, গাঙ ভেরেন্ডার ছাই। একটু

ঘষতে না ঘষতেই দাঁত ঝকঝকে।

পুকুরে গিয়ে নামলুম। শীত, শীত করছে—তাও গ্রাহ্য করলুম না। বাবা আমাকে গীতার শ্লোক মুখস্থ করাতেন ঃ

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

সুখ আর দুঃখ দুটোকেই তুমি সমান ভাবতে শেখো। জয় আর পরাজয়, দুটোকেই তুমি গ্রাহ্য কোরো না। বাবা বলতেন, শুধু পড়লেই হবে না। রোজ ভাববে। জীবনকে সত্যি সত্যি সেই ভাবে তৈরি করার চেষ্টা করবে। মুখে এক, মনে এক তা যেন না হয়। মুখ আর মন এক করবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলতেন। ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর মন দেখেন। সেই থেকে আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। বাবা বলতেন, ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন। তিনি সব দেখছেন, সকলকে দেখছেন। বাবা আমাকে রবীন্দ্রনাথের একটা গান মুখস্থ করিয়েছিলেন, ভারি সুন্দর ঃ

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে॥
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে,
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে॥
ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা,
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে॥

'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে'—এই লাইনটা মনে আসা মাত্র, আমি কেমন যেন হয়ে যাই। অনেক চোখ দেখতে পাই আকাশে। আমার নিজের বাবা, মায়ের চোখ, আমার গোকুলবাবার চোখ, সাধুজির চোখ। তাঁরা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন স্থির দৃষ্টিতে। আমি নিজেই তখন স্থির হয়ে যাই।

ভোরবেলা পুকুরের জলের রঙ হয় গোলাপী। শালুক আর পদ্ম পাতা জলের সঙ্গে সেঁটে ভাসছে। সারারাত তারা ভরা আকাশের তলায় ভীষণ সাধনা করে যেন পদ্মাসনে ভাসছে। পুব আকাশে সূর্য দেখে

পদ্ম তার দলগুলি মেলতে শুরু করেছে। ফড়িং যেন তদারকি করছে। পাপড়ি মেলতে অসুবিধে হচ্ছে কি না! বড় বড় গাছের মাথায় রোদ লেগেছে। বাবা বলতেন, বড় গাছ সবার আগে রোদ ধরে। তেমনি খুব বড় মন সবার আগে তাঁর কিরণ পায়। হঠাৎ আমার নজর চলে গেল পুকুরের ও-পারের বাগানে। কে-একজন ফুল তুলছে! ছবি! ছবি ফুল তুলছে। ছবি আজকাল একেবারেই বাড়িতে আসে না। নিজেকে খুব বড় ভাবে। মায়ের চেয়েও বড়। নিজের মায়ের চেয়ে পৃথিবীতে আর কেউ বড় আছে? আমি মনে করি যাঁকে মাকে আমি মা বলে ডেকেছি, তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। ছবি, তুমি ভগবানকে নিয়ে থাকো, আমি থাকি আমার মাকে নিয়ে।

মা আছে আর আমি আছি, ভাবনা কী আর আমার?
আমি মায়ের হাতে খাই পরি, মাঁ লয়েছে সকল ভার।

ঝপাঝপ গোটা কুড়ি ডুব মেরে উঠে পড়লুম। আমারও ফুল তোলা আছে। ঠাকুর-ঘরে কাজ আছে। ছবি আমাকে কি দেখাতে চায়। আমি আমার মায়ের সেবা করতে করতে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবো। আমার বাবা আমাকে বেশ বলতেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। বলতেন, ভেবে দেখো, বাঁদর ছানা হবে, না বেড়াল ছানা! বাঁদর ছানা করে কি? মায়ের পেটের কাছটা আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকে। তার মা যখন বুঝতে পারে, ছানা আমাকে ধরে আছে, তখন একটু খেয়াল করে, পড়ে না যায়। যেখানে যায় ছানাটিকেও সেখানে নিয়ে যায়। এটা হল জ্ঞানীর পথ। সজ্ঞানে আমি মাকে ধরেছি। মা আমাকে ঠিকই ধরে থাকবেন। আর এক হল বেড়াল ছানা। মা-বই কিছু জানে না। পড়ে পড়ে মিউ মিউ করে। মা এসে ঘাড়ে ধরে, কখনও খাটে তুলছে, কখনও সোফায়, কখনও খাটের তলায় প্যাকিং বাক্সে। বাচ্চা মিউ মিউ ছাড়া কিছু জানে না। এই হল ভক্তের পথ। পরম বিশ্বাসে নিজেকে সমর্পণ করে দাও মায়ের হাতে। বাবা গলা ছেড়ে গান ধরতেন,

ভবে সেই যে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীকে জানে।
সে না যায় তীর্থ-পর্যটনে, কালী-কথা বিনে না শুনে কানে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, 'যা করেন কালী' সেই সে জানে।

এই সব ভাবতে ভাবতে আমার স্নান হয়ে গেল। গাছের পাতার ফাঁকে সোনার থালার মতো সূর্য। জল ছপ্‌ছপ করতে করতে আমাদের

উঠনে এসে দাঁড়ালুম। বকুলতলার বেদীর দিকে তাকালে মনটা ছাঁত করে উঠে। ওইখানটায় আমার বাবা বসে থাকতেন। টকটক করছে রঙ, মহাদেবের মতো শরীর। কোথায় চলে গেলেন তিনি। আর কিছু দিন থাকলে কি হত! আমি বড় হতুম। চাকরি করতুম। আমার বাবাকে ছুটি দিয়ে দিতুম সব কাজ থেকে। বলতুম, সারাজীবন অনেক কাজ করেছেন, এইবার কিছু আরাম করুন। আমাদের উঠান ফুলে ফুলে ভরে আছে। বাবা বলতেন, রোজ গাছকে বলবে, 'তুমি কত সুন্দর! তুমি লক্ষ্মী। তুমি আমাকে ফুল দাও। তুমি ফুলে ফুলে ভরে যাও। গাছ মানুষের কথা বুঝতে পারে। প্রশংসা করলে তার আনন্দ হয়।' আমি রোজ গাছেদের সেই কথা বলি। আর আশ্চর্য, সকালে দেখি গাছ ফুলে ফুলে ভরে আছে। একটা পঞ্চমুখী জবার ফুল আসছিল না কিছুতেই। পর পর তিন দিন হাত জোড় করে গাছকে বলেছিলুম। কি অবাক কাণ্ড! আজ সকালে তিনটে বড় বড় ফুল ফুটে আছে।

বিশাল গেট পেরিয়ে জমিদার বাড়িতে যখন ঢুকছি, ঢং ঢং করে তখন ছটা বাজছে। সময়ের একটু এদিক ওদিক হয়নি। সায়েবরা না কি এইরকম সময় মেনে চলেন। দূরে দেখছি জমিদারবাবু বল নিয়ে একটা অ্যালসেসিয়ানের সঙ্গে খেলা করছেন। কুকুরটাকে কাল আমি দেখিনি। কাছাকাছি হতেই কুকুরটা আমার দিকে তীরবেগে ছুটে এল। প্রথমে বেশ একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। দিলে বুঝি কামড়ে। পরক্ষণেই মনে হল, ভয় পেলেই কামড়াবে। ভয় পাবো কেন? বাবা বলতেন, মানুষ ছাড়া কোনও প্রাণী অকারণে কামড়ায় না। পশুজগৎ আজও সেই পুরনো নিয়মে চলছে। কোনও কুকুর বলবে না, দিনকাল কী ভীষণ পাল্টে গেল, কুকুর আর আগের মতো নেই। ছেলেগুলো সব বখে গেল। মানুষ বলবে, কারণ, কোনও কালেই বাপের সঙ্গে ছেলের মিল হয় না। এক যুগের সঙ্গে আর একযুগের ভীষণ তফাৎ।

কুকুরটা একেবারে কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি স্থির হয়ে বললুম, 'স্টপ'।

আশ্চর্য! কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জমিদার-বাবু কিছু দূর থেকে বললেন, 'বাঃ, তোমার তো বেশ সাহস আছে!

তোমার দেখছি অনেক গুণ !' জমিদারবাবু কুকুরকে ডাকলেন, 'পাইরেট, পাইরেট।' কুকুর কিন্তু সহজে আমাকে ছাড়বে না। পট পটাপট লেজ নড়ছে। এ হল আদর করার ভাব। আমাকে আদর করবে। আমি মাথা নিচু করে বসে পড়লুম। পাইরেট তার মুখটা আমার দুহাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিল। সারা শরীরটা আনন্দে দোলাচ্ছে। বিশাল, ওজনদার কুকুর। আদরের ঠেলায় আমি একপাশে কাত হয়ে গেলুম। পাইরেট চকচক করে আমার গোটা মুখটা চেটে দিল। জমিদার মশাই বললেন, 'বাঃ, বাঃ, এইটাই প্রমাণ হল. তুমি একটা গুড সোল। তোমার অন্তর পরিষ্কার।' পরের আদেশটা কুকুরকে দিলেন, 'পাইরেট, অনেক হয়েছে, এইবার ছেড়ে দাও।'

শিক্ষিত কুকুর। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর কাছে ফিরে গেল। আমি উঠে পড়লুম। জমিদার মশাই বললেন, 'যাও, মুখ ধুয়ে এস। কুকুরের লালা লেগে আছে। ওই ওপাশে কল আছে। গাছের ডালে দেখ আমার একটা সাদা তোয়ালে ঝুলছে।'

'আপনার তোয়ালে আমি ব্যবহার করতে পারবো না বড়বাবু।'

জমিদারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেলেন। যেন আমি কোনও ঘোরতর অপরাধ করে ফেলেছি! তিনি বললেন, 'ছি, ছি, এ কি কথা? চাকরবাকরের মতো মনোবৃত্তি। তুমি আমাকে বড়বাবু বলবে কেন? আমি বড়বাবু, ছোটবাবু, কোনও বাবুই নই। জমিদারবাবুও নই। আমার নাম ব্রজরঞ্জন।'

'আপনাকে তাহলে আমি কি বলব?'

'একটা সম্পর্ক তৈরি করো। আমাকে তুমি জ্যাঠামশাই বোলো। তোয়ালেটায় মুখ মুছো। ওটা আমার বাড়িতে যাঁরা আসেন তাঁদের জন্যে।'

মুখ ধুয়ে, মুছে আবার আমি তাঁর সামনে এসে, দাঁড়ালুম। 'জ্যাঠামশাই. এইবার কি হবে?'

'এইবার আমরা সারা বাগানটা একপাক ঘুরবো। কোন গাছ কোথায় কেমন আছে দেখবো। কারোর অসুখ করেছে কি না, কোনও অসুবিধের মধ্যে পড়েছে কি না খোঁজ নোবো। দেখবে, গাছ মানুষের কত বড় বন্ধু!'

মনে হল, আমার বাবা কথা বলছেন। আমার গোকুলবাবাও ঠিক

এই কথা বলতেন। 'গাছের সঙ্গে ভাব করবে! গাছকে বন্ধু করবে। সারাজীবন বড় আনন্দে থাকবে।' আমরা বাঁদিকে পথ ধরে হাঁটিতে লাগলুম। খুব একটা জোরে নয়। ধীরে, ধীরে। নদীর গোলগোল পাথর বিছানো পথ। জোরে হাঁটিতে গেলে পা হড়কে যায়। দু'পাশে গাছ আর গাছ। চাঁপাই কত রকম! কাঁঠালি, কনক, স্বর্ণ, কাঠ। রঙ্গন! সেই বা কত রকম! লাল, সাদা, গেরুয়া, নীল। জবা! তারই বা কত ধরন! কত রকম! অবাক হয়ে দেখার মতো। দেখছি, আর মনে পড়ছে বাবার শেখানো সেই কবিতা ঃ

মহানন্দে হেরো গো সবে, গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা
জগত পথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা।
তাঁহা হতে নামে জড়-জীবন-মনপ্রবাহ,
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম সৃজনধারা।

জমিদারবাবু চলতে চলতে বললেন, 'কি ভাবছ বাবা ?'

'আজ্ঞে, আমি একটা কবিতা ভাবছি। আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন।' কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনালুম।

'বাঃ, বাঃ, এই কবিতা তুমি মুখস্থ করেছ ? রবীন্দ্রনাথ! তিনি ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন। এই কবিতা আমিও ভাবছিলুম এই মুহূর্তে! আশ্চর্য ব্যাপার! তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে হে!'

সুপুরি গাছের একটা পাতা খসে পড়েছিল একটা পান্হপাদপের মাথায়। জমিদারবাবু থমকে দাঁড়ালেন, 'দেখেছো, কি কাণ্ড! পান্হপাদপের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যে বন্ধ হয়ে যাবে। চলো, চলো পাতাটা সরাই।'

'জ্যাঠামশাই, আপনি দাঁড়ান। আমি করে দিচ্ছি। এই সব কাজ আমি ভাল পারি।'

পাতাটাকে সাবধানে তুলে, বাগানের এক কোণে ফেলে দিয়ে এলুম। পান্হপাদপের কষ্ট দূর হল। জমিদারবাবু বললেন, 'শুনতে পেলে, গাছটা তোমাকে ধন্যবাদ দিল।'

'জ্যাঠামশাই, আপনি শুনতে পেলেন ? আমি তো পেলুম না।'

'গাছের সঙ্গে আরও কিছুদিন মেলামেশা করো, তাহলে তোমারও কান তৈরি হবে। সাধারণ কানে তো শুনতে পাবে না।'

বাগানটা আমরা পুরোটা ঘুরে এলুম। যেখান থেকে শুরু

করেছিলুম, সেইখানেই শেষ হল। কত রকম ফুল আর ফলের গাছ। কত রকমের পেঁপে গাছ। লাল পেঁপে, কালো পেঁপে। পাতার ডাঁটা গুলো সব কালো কালো। ওই গাছ না কি আফ্রিকা থেকে এসেছে!

'জ্যাঠামশাই, এইবার আমরা কি করবো?'

'এইবার আমরা একটু লেখাপড়া করবো। তোমার স্কুল কটা থেকে?'

'আমার তো এখন স্কুল নেই। আমাকে আবার ভর্তি হতে হবে।'

'সে কি? তুমি লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়েছ?'

'না ছাড়িনি। ওই যে আশ্রমে একটা স্কুল হবার কথা ছিল, সেইখানে পড়ব বলে সব গোলমাল হয়ে গেল।'

'সে কি? এখানে একটা এত ভাল একশো বছরেরও পুরনো স্কুল রয়েছে। তুমি সেই স্কুলে পড়বে। আমি ব্যবস্থা করে দোবো। লেখা-পড়ায় গোলমাল ঢুকিও না। যে বয়সের যা। সময় চলে গেলে আর ফিরে আসবে না। একটা বছর তাহলে তোমার নষ্ট হয়ে গেল।'

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলুম। অপরাধীর মতো। সবাই বলেন, সাধু-সন্ন্যাসী-ভগবান মানুষের উপকার করেন। কই আমার তো কোনও উপকার হল না! তাই কি? সকলেরই কি তিনি ভাল করেন! আমার গোকুলবাবা মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন, 'তাঁর যা ইচ্ছা, তিনি তাই করেন। সে ভালও হতে পারে, খারাপও হতে পারে!'

॥ ১৯ ॥

আমি অবাক হয়ে গেলুম। জমিদার মশাই কি সাধু! না সাধুর চেয়েও বড়। এক বাটি ছোলা, নুন আর ছোট ছোট আদার কুঁচি, এই হল তাঁর সকালের জলখাবার। আমি ভেবেছিলুম কত কি না ভাল ভাল খাবার আসবে! এক মুঠো ছোলা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, 'নাও, নাও, তুলে নাও। আদা আর নুন দিয়ে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। এতে তোমার আপত্তি হবে না নিশ্চয়।'

'এই আপনার সকালের জলখাবার?'

'কেন, খারাপ কি? এর চেয়ে ভাল খাবার পৃথিবীতে আর আছে না কী? যে-কোনও মানুষ সহজেই খেতে পারে! শোনো, ভোগ যত বাড়াবে, ততই বেড়ে যাবে। পৃথিবীতে মানুষ ভোগ করতে আসে না, আসে ত্যাগ করতে। ভোগের মধ্যে থেকে ত্যাগ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তোমার কিছু নেই তো তুমি কি ত্যাগ করবে! আগে অর্জন করো, তারপর বর্জন। আমার সেই পথ। এই যে দেখছ সম্পদ, বৈভব এ-সবই আমি নিজে গড়ে তুলেছি। সামান্য কিছু ছিল পূর্বপুরুষের। সৎপথে থেকেই করেছি। এর মধ্যে কোনও চুরি জচ্চুরি, প্রজাদের গলায় গামছা দিয়ে খাজনা আদায় নেই। সবই এসেছে বাণিজ্য করে। এখন আর আমি কিছু করি না; তার কারণ আমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তবে হ্যাঁ বলতে পারো, সবারই যিনি আছেন, তিনি আমারও আছেন, ঈশ্বর। আমি চলে যাবার পর এইসব কি হবে! একটা কবিতা শোনো,

ধনী যায় শ্মশানেতে বাজে ঢাক ঢোল,
ছড়ায় সুবর্ণ, কত ক্রন্দন কল্লোল।
সেই অনির্দেশ দেশে বংশখণ্ডে চড়ি
দুঃখী যায়—সেও পায় ধরণীর কোল!

সবারই শেষ সেই এক মুঠো ছাই। তোমার এখন বয়স কম, তবুও সব সময় মৃত্যুকে স্মরণে রেখে সব কাজ করবে। আজ আছি, কাল নেই। কালের জন্যে ফেলে রেখ না কিছু। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে তোমাকে দেখে। তোমার সংস্কার খুব ভাল।

তোমার মাথাও খুব ভাল। তোমাকে আমি তৈরি করব নিজের হাতে। মানুষ মানুষকে অনেক কিছু উপহার দেয়। আমি তোমাকে উপহার দোবো তোমারই সুন্দর জীবন।'

আদা আর ছোলা চিবোতে চিবোতে, জমিদারবাবু চলে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ বসে রইলুম হাঁ করে। বেশ ভাল লাগছে ভাবতে, এই সুন্দর বাড়ি, বাগান, এত বড় লাইব্রেরি, এর মাঝে আমি বড় হব। আরও বড়। লেখা-পড়া শিখব, গান শিখব, ছবি আঁকা শিখব। সাদা একটা মটোর গাড়ি চড়ে, আমার মাকে নিয়ে বেড়াতে বেরবো। আমার তখন সুন্দর চেহারা হবে। যে, যা চাইবে, আমি তাকে তাই দিয়ে দোবো।

অপূর্ব সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক এসে আমার হাত ধরলেন, 'চলো, ওঠো। আমার সঙ্গে এসো!' ভদ্রলোকের মাথা ভর্তি চুল। খাড়া এতখানি নাক। লম্বা ছফুট। একেবারে সাদা পোশাক।

আমি ভয় পেয়ে গেছি, 'আপনি কে?'

'আমি তোমার বন্ধু। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চলো।'

বাগানের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা একেবারে পূব দিকের শেষ মাথায় চলে গেলুম। সেখানে ঝকঝকে সুন্দর একটা ঘর। মেঝেতে অপূর্ব একটা কার্পেট পাতা। দেয়াল থেকে দেয়াল। ঘরে আর কোথাও কিছু নেই। কার্পেটের মাঝখানে বসে আছেন জমিদারবাবু। আমাকে দেখে বললেন, 'এসো, এসো, চলে এসো, তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। তুমিই আমার সেই ছেলেবেলা। যেটাকে অনেক কষ্টে মেরে বসে আছি। ভেতরের শিশুটা মারা গেলে মানুষ বাঁচে কি করে। যত দিন সে শিশু যত দিন সে ছাত্র. তত দিনই তার বেঁচে থাকার সুখ। দেখ দেখি কাণ্ড, আমি এমন সব কথা বলছি, যা বোঝার বয়স তোমার এখনও হয়নি। তবু শোনো, শুনতে শুনতে, বয়েস হবার আগেই তোমার ভিতরে একটা ভাব দানা বাঁধবে। যাক গুরুজী, এইবার তাহলে শুরু করে দিন।'

সবটাই আমার কাছে ধাঁধার মতো লাগছে। গুরুজী, মানে কিসের গুরু! ভারি সুন্দর মানুষটি। তিনি এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'প্রণাম করো।'

আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম করতে গেলুম। তিনি তাড়াতাড়ি

আমার হাত দুটো ধরে ফেলে বললেন, 'আমাকে না, আমাকে না।'

'তাহলে কাকে গুরুজী ?' আমার মুখ ফসকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

গুরুজী বলায় তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, 'তোমার হবে। তুমি সহজেই ধরতে পার। প্রণাম করো নিরাকার ব্রহ্মকে। বুঝতে পারলে না তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ পেরেছি। আমার বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়ে ছিলেন,

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত-মন্দিরে ॥'

গুরুজী বললেন, 'বহত আচ্ছা, বহত আচ্ছা। সুরে বলো, সুরে।'

সুর আমার জানাই ছিল। কতবার বাবার সঙ্গে একসঙ্গে গেয়েছি। আর আমি তো পথের ছেলে, পথেই মানুষ। আমার তেমন ভয়ডর নেই। ঠিক সুরে অন্তরাটা ধরে ফেললুম,

'অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অসীম-মহিমা-মগন
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে ॥'

গুরুজী আর জমিদারমশাই একই সঙ্গে আস্হায়ীটা ধরে ফেললেন,

'হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি
কতই বরণ, কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দ রে
বিহগগীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়
মহাপবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে ॥'

ওই কত কত শত ভকত প্রাণ লাইনটায় এলেই আমার গলা বুজে আসে। ভীষণ কান্না পায়। আমি একটা বিশাল পাহাড় দেখতে পাই। একলা একটা নদী। দেখতে পাই বহু মানুষ লাঠি হাতে ধীরে ধীরে সেই পাহাড় চুড়োর দিকে চলেছে। একটা মন্দির। কেদারনাথ। বদরীনাথ। গঙ্গা নেমে আসছে গোমুখী থেকে। আজ আমার কান্নাটা খুব জোরে এল। আমার যে কেউ নেই। মনে পড়ে গেল সেই বাঁদরটার কথা। একজন মাঝে মাঝে নিয়ে আসে আমাদের পাড়ায় খেলা দেখাতে। লোকটা যা বলে বাঁদরটাকে তাই করতে হয়। অবাধ্য হলেই

ছপটি খায়। যতদিন বাঁচবে বাঁদরটাকে খেলা দেখাতে হবে। সকলের মন যুগিয়ে চলতে হবে! তা না হলে খেতে পাবে না। আমারও তো সেই একই অবস্থা। নাচ দেখিয়ে, মন যুগিয়ে বাঁচতে হবে। কখনও এখানে, কখনও ওখানে।

আমি মাটিতে বসে পড়লুম। বুক ফেটে যাচ্ছে। আর একটা গান মনে পড়ছে, 'যার কেহ নাই, তুমি আছ তার। তুমি আপন হইতে হও আপনার।' এইরকম সময় আমি মনে মনে বলি, কোথায় আমার মধুসূদন দাদা! একা আমার যে ভীষণ ভয় করছে। তুমি এসে আমার হাত ধরো। পাছে কেউ দেখে ফেলেন, একটা বুড়ো ছেলে কাঁদছে, তাই মাটিতে মাথা ঠেকালুম। আমায় তো প্রণামই করতে বলেছিলেন গুরুজী!

আমার পিঠে একটা হাত এসে পড়ল। গুরুজী আর জমিদার মশাই একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বড় পবিত্র আধার।' গুরুজী আমাকে দু'হাতে ধরে তুললেন। আমাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে, দু'কাঁধ ধরে, চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ব্রহ্ম কি তা তুমি জান। আমাদের চেয়েও ভাল জান। তোমার এই ভাবটা যেন থাকে। সেই ব্রহ্মের ধারণা করে এই শরীর। শরীর একা কিছু পারে না, যদি না মন সাহায্য করে। শরীরের সঙ্গে মনের যোগ সাধনকেই বলে যোগ। তোমাকে আজ আমি সেই যোগে দীক্ষা দোবো। মনে মনে প্রস্তুত হও।' আমি তো মনে, মনে প্রস্তুতই। সাধুবাবা আমাকে তো আগেই দীক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি পরলোকে চলে না গেলে, আমার জীবনটা তো অন্যরকমই হয়ে যেত।

গুরুজী বললেন, 'পদ্মাসন পারো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে দেখাও।'

কার্পেটের একপাশে বসে, আমি নিমেষে পদ্মাসন করে ফেললুম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বাঃ। কাজ তো অনেকটা এগিয়েই রেখেছ। আচ্ছা, এইবার আলতো করে চোখ বোজাও।'

আমি নির্দেশ পালন করলুম। চোখের পাতা দুটো ফেলে দিলুম আলগা করে। আমার কানের কাছে মুখ এনে, তিনি বললেন, 'কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

'আজ্ঞে, পাখির ডাক আর বাতাসে গাছের পাতা নড়ার শব্দ।'

'ঘরে একটা দেয়াল ঘড়ি রয়েছে। পেন্ডুলামের টক্‌টক্‌ শব্দটা শোনার চেষ্টা করো, শোনা মাত্রই বলবে।'

পাখির ডাক আর বাতাসের শব্দ থেকে কান তুলে ঘড়িতে রাখলুম। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি শব্দ। বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।'

'বেশ, কানটাকে ধরে রাখ। আর কোনও শব্দ তুমি শুনবে না। চোখে কি দেখছ?'

'একটা আলো।'

'বিন্দু না আভা? কোনও আকৃতি আছে?'

'না। ছড়ানো আলো।'

'কপালের মাঝখানে, ভুরুর মধ্যে প্রদীপের একটা শিখাকে ধরার চেষ্টা করো। শিখাটা হবে স্থির। যখনই কাঁপবে, মন দিয়ে আড়াল করে স্থির করবে। তোমার তীব্র সংকল্প হবে শিখাকে আমি নড়তে দোবো না। হেলতে, দুলতে দোবো না। সেইটাই হবে তোমার শক্তির পরিচয়। সেইটাই হবে তোমার লড়াই। শরীর একেবারে নরম শিথিল। সামনে কুঁজো হবে না, মেরুদণ্ড দোমড়াবে না। চোখের পাতা দুটো শুধু মাত্র পড়ে থাকবে। আর চিন্তা! কোনও চিন্তা কাছে ঘেঁষতে দেবে না। চিন্তা তোমার একটাই, আমি প্রদীপের শিখা। আর তোমার গোঁ হবে, আমি কতক্ষণ এইভাবে বসে থাকতে পারি। তুমি চালাও। আমি এইবার আমার বড় শিষ্যকে দেখি।'

প্রথমে ভেবেছিলুম, এ আর কি এমন কঠিন কাজ! একটা শিখা দেখবো। কানে শুনবো ঘড়ির টক্‌টক্‌ শব্দ। অসুবিধে কোথায়। ও বাবা, এর চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছু নেই। শিখা থেকে থেকে দুলে যায়। কান সরে যায় ঘড়ির শব্দ থেকে। আর অজস্র চিন্তা ঢুকতে চায় মনে। কোনটাকে সামলাই। অনেকটা সাইকেল চালাবার মতো অবস্থা। ঘণ্টা নেড়ে পঞ্চপ্রদীপে আরতির মতো। প্রদীপ নড়ে তো ঘণ্টা থামে। ঘণ্টা নড়ে তো প্রদীপ থামে।

কিন্তু আমার গোঁ। সে তো সাংঘাতিক। আমি তো সহজে হারব না। নিজের সঙ্গে নিজের সাংঘাতিক লড়াই শুরু হয়ে গেল। কোনও কিছু ঠিক মতো না পারলে আমার এইরকম হয়। আমি

পাগলের মতো হয়ে যাই। আমি আর বাইরে নেই। আমার ভেতরে চলে এসেছি। সাপ যে-রকম গর্তের মধ্যে সিঁধিয়ে যায় অনেকটা সেইরকম।

বেশ কিছুক্ষণ এই লড়াই চলার পর গুরুজী আমার কানের কাছে আস্তে আস্তে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত। একদিনে হবে না। ধীরে ধীরে হবে। হঠাৎ একদিন তুমি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করবে। নতুন রূপে। তোমার নতুন জন্ম হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, হাঁড়ি যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ততক্ষণই তাকে গড়াপেটা যায়, পুড়িয়ে পাকা করে ফেললে আর কিছু করা যায় না। শৈশব হল সেই কাঁচা হাঁড়ি। যা করতে হবে তা এই বয়সেই করতে হবে। কাল যখন আবার দেখা হবে, তুমি লিখে আনবে আজকের অভিজ্ঞতা। যা তোমার হল বা হচ্ছিল। ঠিক ঠিক লিখবে, ভেবে ভেবে, চিন্তা করে।'

গুরুজী চলে গেলেন। জমিদার মশাই চিৎ হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে রইলেন মৃতের মতো। তারপর এক সময় উঠে বললেন, 'কেমন লাগল তোমার?'

'আজ্ঞে ভীষণ ভাল।'

'বিরক্ত হলে না তো?'

'আজ্ঞে না। এই সব আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'তোমার গান শেখার ব্যবস্থাও আমি করব। গানও তোমার হবে। খুব ভাল হবে। ভীষণ ভাল। জীবনে যাতে তুমি অনেক বড় হতে পার, পয়সায় নয়, গুণে, তার জন্যে যা করা দরকার আমি করব।'

'আমি একটু একটু তবলা বাজাতে জানি।'

'তাই না কি? শিখলে কোথায়?'

'আমার বাবার কাছে। তারপর ওই আশ্রমে এক ফকির এসেছিলেন। তাঁর ছিল সাংঘাতিক হাত। তিনিও আমাকে তালিম দিতেন।'

'তাহলে চলো, বসা যাক একটু দু'জনে মিলে।'

'আপনার সঙ্গে আমি তবলা বাজাবো! আমার যে ভয় করবে।'

'তুমি কি ভাবছ, আমি একটা বিরাট ওস্তাদ? আমিও শিক্ষার্থী।'

তাঁর পেছন পেছন কোথায় চলেছি জানি না। বিশাল এই বাড়ির কোথায় কি আছে। খিলানের পর খিলান। দরজার পর দরজা। মার্বেল পাথরের মেঝে। যাঁর এত, তিনি এত সাধারণ!

॥ ২০ ॥

আমরা তিনতলার ছাদের একটা ঘরে এলুম। জমিদার মশাই বললেন, 'এইটা আমাদের গানের ঘর। তোমার আর আমার গান হবে এইখানে।'

নরম তুলতুলে কার্পেট। বাজনা রয়েছে অনেক। তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা। পাখোয়াজ। সেতার। বেহালা। বাঁশি। দেয়ালে বড় বড় ওস্তাদের ছবি।

আমাকে বললেন, 'তানপুরাটা সাবধানে নিয়ে এস ; কোথাও যেন ঠোকা না লাগে। নেওয়ার আগে নমস্কার করবে।' বিশাল তানপুরা। রেশমের আলখাল্লা পরা। সাবধানে তানপুরাটা এনে কার্পেটের ওপর রাখলুম। তিনি জোড়হাতে নমস্কার করে ঢাকনা খুলে ফেললেন। ঝকঝকে যন্ত্র। হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়।

'যাও, এইবার হারমোনিয়ামটা টেনে আনো। ভীষণ ভারি। তলায় চাকা লাগানো, টানলেই চলে আসবে।'

হারমোনিয়ামও তেমনি সুন্দর। হারমোনিয়ামের পর্দা টিপলুম। শুরু হল বাঁধা। সারা ঘর ঝলমলিয়ে উঠল সুরে। আমাকে বললেন, 'নিয়ে এস তবলা।' তবলাটা তিনিই বেঁধে দিলেন। সহজ তালেই গান ধরলেন। ত্রিতাল। ষোল মাত্রার তাল বাজান তেমন কঠিন নয়। প্রথমে একটু ভয় ভয় করছিল। মাত্রা ঠিক থাকলেও, লয় না বেড়ে যায়। বেশ সজাগ হয়ে বাজাতে বাজাতে শেষে লয়টা ধরে গেল। তখন আর আমাকে পায় কে! দু-একটা ছোটখাট কাজও দেখাতে লাগলুম! অসম্ভব সুন্দর গলা। তেমনি সুর। আমার বাজনা দেখে বারকয়েক 'বাঃ বাঃ' বললেন। আমার হাত আরও খুলে গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক গান হবার পর, তিনি তানপুরা নামিয়ে রেখে বললেন, 'তুমি তো একটি রত্ন হে! আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছ। তোমাকে তো ছাড়া যাবে না। প্রতিভা, প্রতিভা।'

কেউ কখনও আমার প্রশংসা করেনি। আমার গোকুলবাবা বলতেন, 'নিজের প্রশংসা কখনও শুনবে না। প্রশংসা শোনা মহাপাপ।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'আমার প্রশংসা করবেন না।'

'কেন করব না! গুণের প্রশংসা অবশ্যই করা উচিত। তাতে মানুষের উৎসাহ বাড়ে। আরও এগোও, আরো, আরো। কোন কিছুর শেষ নেই। সবই অনন্ত। আচ্ছা আমাদের সকালের পর্ব এই পর্যন্ত। চলো, আমরা এইবার স্নান করব।'

'আমার তো হয়ে গেছে সেই ভোরবেলাই।'

'তাহলে আচ্ছা করে সরষের তেল মর্দন করে পুকুরে গোটাকতক ডুব মেরে আসি। তুমি সাঁতার জানো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে তোমার সঙ্গে একদিন আমার সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে।'

'আপনার যে অত সুন্দর বাথরুম!'

'ধুর, ওসব কার। বাড়ি করলে একটা বাথরুম করতে হয় তাই করা। জীবনের প্রয়োজন, ভোগ, এ-সব বেশি বাড়াতে নেই। মাটির কাছাকাছি থাকতে হয়। সব সময় বাস করবে বাড়ির বৈঠকখানায়। প্রয়োজনেই যাতে ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। কিছুই কিছু নয় বুঝলে, সবই খেলা। সবই মায়া। থাকার মধ্যে থাকে মানুষের সাধনা। মানুষ বাঁচে ভালবাসার জন্যে, সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে। সুন্দর সুন্দর বাড়ি, সুন্দর বাগান, সুন্দর শরীর, সুন্দর রঙ, সুন্দর মন, সুন্দর গান। সুন্দরের সুন্দর এই পৃথিবী। আমি বড় বেশি কথা বলি তাই না! সারাটা দিন কেবল বকবক।'

'আপনার কথা শুনতে ভীষণ ভাল লাগে।'

'তুমি বুঝতে পার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তার মানে কি জানো, তোমার সংস্কার খুব ভাল। এ এক গভীর রহস্য। এই পূর্বজন্ম, কেউ মানে, কেউ মানে না। আমি মানি। আমরা বারে বারে জন্মাই। এই জন্মে যা কিছু ভাল করে যাব তার ফল পাবো সামনের জীবনে। আসছে বার আরও ভাল জীবন হবে। যেমন তুমি। গতবার খুব সাধনভজন করেছিলে তাই এবার প্রথম থেকেই জীবনের ভাল-র প্রতি তোমার এত আকর্ষণ। যে-সব কথা তোমার এই বয়সে বোঝা উচিত নয়, তুমি সহজেই বুঝতে পার। তুমি গড়গড় করে ইংরিজি, বাংলা পড়তে পার। সুন্দর তবলা বাজাতে পার। এই বয়স থেকেই তোমার ভাবটাই আলাদা। সাবধানে থাক।

নিজেকে নষ্ট করে ফেল না। যাও তুমি আমার লাইব্রেরিতে চলে যাও। আমার স্নান, পুজো হয়ে গেলে তোমাকে ডাকব। আমরা একসঙ্গে খাবো।'

আমি লাইব্রেরিতে গেলুম। শ্বেতপাথরের মেঝে। ঝকঝক করছে চারপাশ। কত বই! বই আর বই। আমার মনে হল কোন র‍্যাকে কি বই আছে আমার দেখা উচিত। আমার জেনে রাখা উচিত। কাজের সুবিধে হবে। যে-কোনও বই চাইলেই ঝট করে বের করে দিতে পারব।

বইয়ের জগতে মশগুল হয়ে ছিলুম। হঠাৎ আমার মায়ের বয়সী এক মহিলা দরজার বাইরে থেকে ডাকলেন, চলে এস। আমি তাঁর পেছন পেছন ভেতর বাড়ীতে গেলুম। চমকে দেবার মতো বাড়ি। বিশাল বাঁধানো উঠোন। দু'পাশ দিয়ে দুটো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। জাফরি ঘেরা বারান্দা। ঐশ্বর্য যেন ঝরে পড়ছে। তাকাতে তাকাতে ভয়ে ভয়ে চলেছি। দুধ-সাদা সিঁড়ি। পা রাখতে ভয় করছে। যদি ময়লা হয়ে যায়। একপাশ দিয়ে গুটি গুটি কোনও রকমে দোতলায় উঠলুম। দেয়ালে বড় বড় আয়না। দুপুরের আলো ঝলমল করছে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন জমিদারমশাই। পরে আছেন পুজোর কাপড়। হেসে বললেন, 'তোমাকে একটু প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের বংশের নিয়ম।'

একটু ভয় পেয়ে গেলুম। প্রস্তুত! প্রস্তুত মানে!

আমার ভাব দেখে তিনি হেসে ফেললেন, 'ভয় পেলে না কী। ভয় পাবার মতো কিছু নয়। সামান্য একটু পরিচ্ছন্নতা। তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি কি পরে আছি! আমরা খাওয়াকে খাওয়া ভাবি না, আহার করো মনে করো আহুতি দি শ্যামা মাকে। ওই কোণে বাথরুম, সোজা চলে যাও, হাত পা ধোও। ওইখানেই দেখবে ধুতি আর পাঞ্জাবি আছে। যা পরে আছ, ছেড়ে একপাশে রেখে, পরে এস।'

হতভম্ব আমি। এমন কাণ্ড কোনও বাড়িতে হয়! বাথরুমে গিয়ে অবাক। স্বর্গ যেন। এমন জায়গা ছেড়ে সাধ করে কেউ পুকুরে যায় চান করতে? যা বলেছিলেন, যেমন বলেছিলেন, সেইরকম করে, খাওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। গোটা বাড়িটাই মার্বেল পাথরে মোড়া। ধূপ জ্বলছে। চন্দনের গন্ধ। ঘরের মাঝখানে বিশাল এক পাথরের

বেদী। সেই বেদীর ওপর ভাল, ভাল খাবার সাজান। সবই গরম। ফুরফুরে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গোবিন্দভোগ চালের ঝরঝরে ভাত। নানারকম তরকারি। পায়েস। তিন-চার রকম মিষ্টি। সব কিছুর ওপরেই তুলসী পাতা। পিলসুজে প্রদীপ। পাথরের গেলাসে জল। পাথরের বাটিতে জল।

বেদীর কিছুটা দূরে দুটো আসন পাতা।

জমিদারমশাই একটা আসন দেখিয়ে বললেন, 'বসে পড়ো।'

পাশেরটায় তিনি বসলেন। সেই মহিলা আমাদের সামনে পেতে দিলেন দুটো বড় কলাপাতা। পরিষ্কার করে ধোয়া। দু'পাশে দু'গেলাস জল। মহিলা, বেদীর ওপর থেকে সমস্ত কিছু একটু একটু করে নিয়ে আমাদের পাতে সাজিয়ে দিলেন। জমিদারমশাই বললেন, 'হাত জোড় করে প্রণাম করে প্রসাদ গ্রহণ করো। তিনি দেন তাই আমরা পাই' তাই আমরা খাই।' জমিদারমশাইয়ের চোখে জল।

সেই প্রসাদ খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরই আমাদের আসল খাবার এল মোটা চালের ভাত। পাতলা ফেরফেরে ডাল। একটা তরকারি' মহানন্দে তিনি খেতে লাগলেন; যেন অমৃত। আমার সবেতেই নুন কম লাগছিল। পাতের কোথাও নুন নেই, একটুকরো লেবু নেই। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, বলতে পারছি না কিছু। জমিদারমশাই বললেন, 'কোনও কিছুর অভাব?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু নুন।'

'ইচ্ছে করেই নুন কম দেওয়া আছে। নুন মানেই স্বাদ। ম্যানুষ এমনিতেই অনেক কিছুর দাস। স্বাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত কর নিজেকে। একটা দোঁহা শোনো। দোঁহা কাকে বলে জানো?'

আমার ঠিক জানা ছিল না; কিন্তু আমি তো সহজে হারব না। তাই উত্তরটা অন্যভাবে দিলুম, 'যেমন তুলসীদাসের দোঁহা।'

'বাঃ, বাঃ, ছেলে আমার সব জানে। সহজে হারান যাবে না। আমি তোমাকে তাঁরই একটি দোঁহা বলব। শোনো কত সুন্দর!

তিন টক্ কপীনকো, আউর ভাঁজি বিন্ লোন্।
তুলসী রঘুবর উর বস', ইন্দ্র বাপুর কোন্॥

মানেটা শোনো, হে তুলসি। যদি রামচন্দ্র হৃৎপদ্মে নিরন্তর বাস করেন এবং তিন খণ্ড কৌপীন আর নুন ছাড়া সামান্য একটু ভাজা

পাওয়া যায়, তাহলে সেই যে তোমার সুরপতি ইন্দ্র, নিজেকে তাঁর চেয়েও ভাগ্যবান মনে কোরো।

'শোনো, মহাপুরুষের উপদেশ শুধুমাত্র শোনার জন্যে নয়। এ-কান দিয়ে ঢুকলো, ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাহলে আর কি হল। জীবনকে যদি না বাঁধতে পারি সেই সুরে, সেই নির্দেশে। আর একটি দোঁহা শুনে রাখ, কাজে লাগবে,

মোটে বস্ত্র গৃহ ছোটে, পণ্ড ধেনু হব' দোয়।
থাকো হোয় সে সুখী গৃহী, দুহিতা যদি না হোয়॥

মোটা কাপড়, ছোট বাড়ি, পণ্ড দুগ্ধবতী ধেনু যার আছে সেই সুখী। কেন সুখী, মোটা কাপড় সহজে ছিঁড়বে না, ছোট বাড়ি কম খরচে মেরামত করা যায়, আর গরু থাকলে দুধের কষ্ট হয় না। এর সঙ্গে আর একটু আছে ; সেটা তোমাকে আর বলব না।'

সেই আলুনি তরকারি দিয়ে মোটা চালের ভাত গপাগপ মেরে দিলুম। পাছে মনে করেন আমার খারাপ লাগছে, তাই আমি ইচ্ছে করে বেশি বেশি খেলুম। খিদেও পেয়েছিল খুব।

জমিদারমশাই বললেন, 'আমাদের আরও একটা কাজ করতে হবে, পাতাটা আমি যে-ভাবে মুড়ছি, সেইভাবে মোড়, তারপর আমার সঙ্গে চলো।'

আমরা দোতলা থেকে নেমে এলুম একতলায়, সোজা বাগানে। বাগানের উত্তর দিকের শেষ মাথায় একটা চৌবাচ্চা, বেশ বড়। পাতাটা তার মধ্যে ফেলে দিলুম। পাশেই কল। কলে হাত ধোয়া হল।

জমিদারমশাই বললেন, 'গোটা কতক নিয়ম অবশ্য পালন করবে, এক নম্বর, নিজের এঁটো কখনও কারোকে পরিষ্কার করতে দেবে না। দু'নম্বর, নিজের জামাকাপড় কখনও কারোকে দিয়ে কাচাবে না। তিন নম্বর, নিজের বিছানা রোজ নিজে পাতবে, নিজে তুলবে। বিছানায় যেন একটা কম্বল থাকে। চার নম্বর, খাওয়া-দাওয়ার পর গোড়ালিতে একটু জল দেবে। আরও সব নিয়ম আছে। একে, একে তোমাকে সব শেখাবো। যেমন এখনি আর একটা মনে পড়ছে, ভাতের সঙ্গে কখনও লেবু খাবে না। স্টার্চ'এর সঙ্গে অ্যাসিড পড়লেই অম্বল হবে।'

আবার আমার আগের পোশাক পরে লাইব্রেরি ঘরের বিশাল টেবিলে এসে বসলুম আমরা। ঘরের সব জানালা খোলা। আলোয় আলো।

জমিদারমশাই বললেন, 'খাওয়া-দাওয়ার পর আমার একটা মজার খেলা আছে। সেটা হল অঙ্কের লড়াই। এসো দেখি, তোমার অঙ্কের ব্রেন কি রকম। তুমি আমাকে একটা বলবে, আমি তোমাকে একটা। কে হারে, কে জেতে। নম্বর দেওয়া হবে। যেমন তোমাকে আমি প্রথম যে সমস্যাটা দিচ্ছি সেটা হল,

একজন লোক এক জালা জল কুড়ি দিনে খেতে পারে
আর তার স্ত্রীও যদি খায় তো চোদ্দ দিনে সেই জল
শেষ হবে। এইবার তুমি বল তার স্ত্রী যদি একা খায়
জালার জল ক'দিনে শেষ হবে!'

আমার দিকে তাকিয়ে জমিদারমশাই মৃদু মৃদু হাসছেন। আমিও হেসে ফেললুম। এটা একটা সমস্যা হল! এ তো আমি নিমেষে বলে দেবো। একটু করো কাগজ আর পেনসিলের প্রয়োজন। উত্তর বেরিয়ে এল, ছেচল্লিশ পূর্ণ দু'এর তিন দিন।

তিনি টেবিল চাপড়ে বললেন, 'মার দিয়া কেল্লা। এইবার আমার পরীক্ষা। তুমি একটা ভেবেচিন্তে বলো।'

'আচ্ছা ধরুন একটা কাঠের গুঁড়ির একের নয় ভাগ কাদায় পোতা, পাঁচের ছয় ভাগ জলের ওপর জেগে আছে, আর দু ফুট আছে জলে, তাহলে গুঁড়ির দৈর্ঘ্য কতো?'

জমিদারমশাই বললেন, 'বহত আচ্ছা। আমার কাগজ পেনসিল লাগবে না।' কয়েক মিনিট চোখ বুজিয়ে থেকে বললেন, 'ছত্রিশ ফুট।' অঙ্কে অঙ্কে দুপুর চলে গেল। বিকেল নেমে এল। বেশির ভাগ পাখিই ফিরে এসেছে গাছের ডালে। এইবার সব বাসায় ঢুকে পড়বে। তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের মহামিলন শেষ হল আজকের মতো। আবার কাল সকালে।'

বিশাল গেট পেরিয়ে রাস্তায়। এতক্ষণ যেন স্বপ্নের মধ্যে ছিলুম। ঘোর লেগে আছে। সেই ঘোরে হাঁটছি। চারপাশে খিচিরমিচির। গাড়ি, ঠেলা। মিল এলাকার লোকজন। আবার সকাল হবে কখন? নেশা লেগে গেছে।

* * *

আজ আপনাকে বলি ঠাকুর। কোনও তুলনা নেই আপনার। আপনারই অতি প্রিয় শিষ্য গিরিশ ঘোষ মশাই 'চৈতন্যলীলা'য় লিখে-

ছিলেন গান, সেই গানেরই একটি লাইন—'কে খেলায় আমি খেলি বা কেন!' কে আবার খেলায়। আপনি খেলান। আপনাকে যে পেতে চায়, ভেঙ্গে চুরমার করে দেন তার সব কিছু, গৃহসুখ, দেহসুখ, কেড়ে নেন ধনজন বিত্তমান। আগুন ধরিয়ে দেন তার সংসারে। সে তখন গেয়ে ওঠে—'যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্গল ঝড়ে।'

আপন মনে হাঁটছি। পেছনে একটা হই হই উঠল, 'সামালকে সামালকে, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার।' আরও একটা শব্দ। যেন ঘোড়া ছুটছে। কিছু বোঝার আগে, কিছু করার আগে আমার পিঠ ফুঁড়ে কি একটা ঢুকে গেল। এক লহমার জন্যে দেখতে পেলুম, বিশাল বড়, কালো একটা ষাঁড়। তারপর আমার আর কিছু মনে রইল না। সুখের সন্ধানে, উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের আশায় লালায়িত হয়েছিলে তুমি। মূর্খ!

ঠাকুর আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলে দিলেন, এই তো চাই আমি :

সুখমে বাজ প'ড় দুখকে বলিহারি যাই।
অ্যায়সে দুখ্ আওয়ে যো, ঘড়ীঘড়ী হরিনাম সোঁরাই ॥

সুখে তোমার বাজ পড়ুক। দুঃখ তোমাকে বলিহারি যাই। প্রচণ্ড দুঃখ এসো, তবেই তো উঠতে বসতে তোমার নাম আমি করব প্রভু!

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত